চোখ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

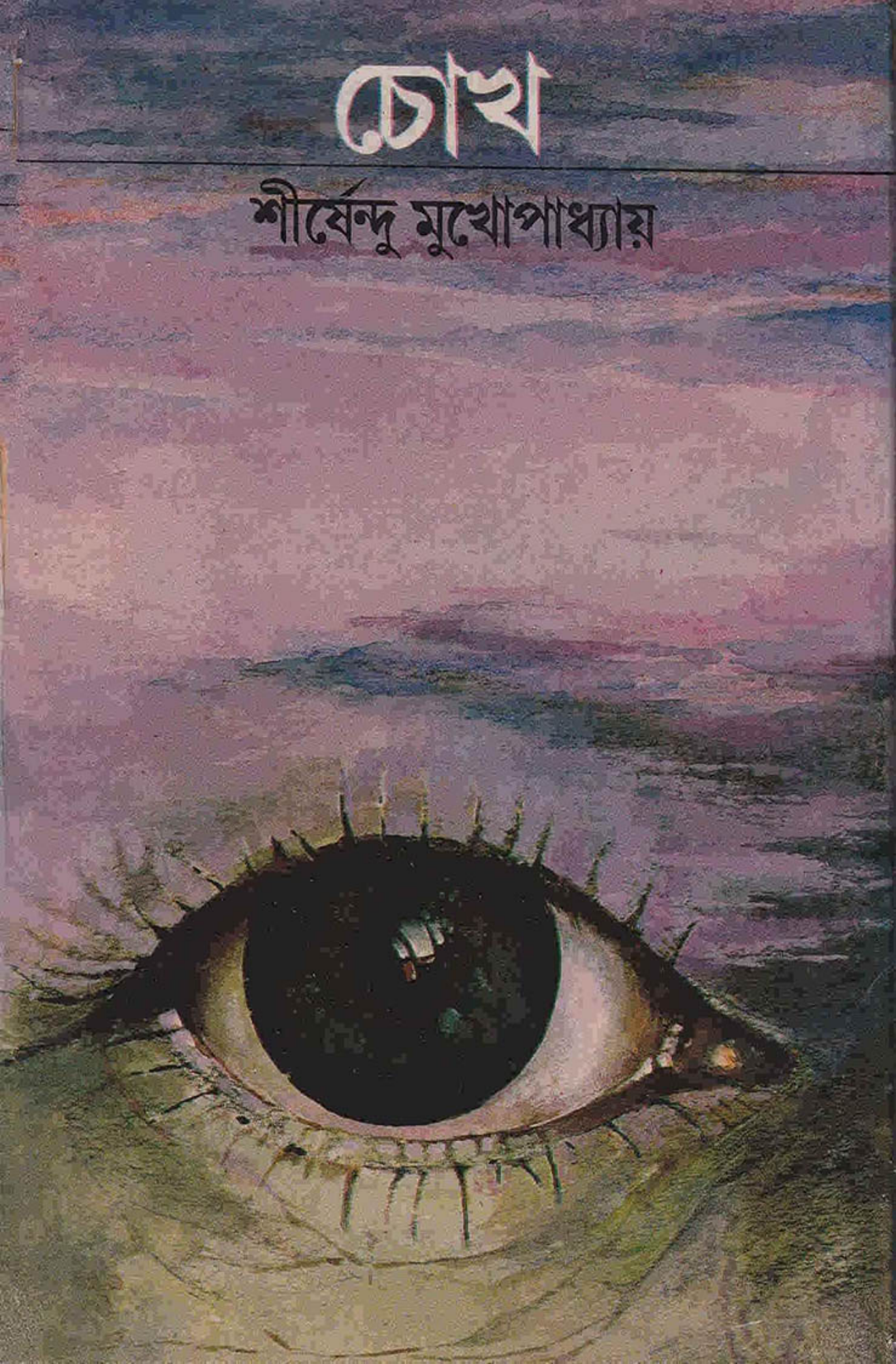

তোমার চোখ দুখানার মধ্যে কী যেন ধক ধক করে ওঠে বাপা। প্রায়ই দেখি। কী যেন একটা শক্ত করে চাপি রাখিছ ভিতরে, একদিন ফাটে বেরোবেনে, রাগ টাগ বেশি পুষে রাখলি পরে মানুষ বড় ক্ষয় পায়, মাথাটাও ঠিক থাকে না, কী করতি কী করে বসে।

যীশু কথাটার কোনো জবাব দেয় না। বাদাম গাছটায় কখন থেকে একটা কাঠঠোকরা এক নাগাড়ে ঠক ঠক করে ঠুকরেই যাচ্ছে। পারেও পাখিটা, কী রস যে পায়। রোদের ভিতরে একটা দুটো বোলতা ওড়াউড়ি করছে।

তিন দিন আসিছ, কথাও তেমন কও নাই। তোমার ভাবগতিক আমার ভাল ঠেকে না বাপ, আর তোমার তো একটা বউও ছিল। তার হল কী?

যীশু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, বকুলও তো ওই কথাই বলে।

কী বলে মেয়েটা?

ওই আপনি যা বললেন। আমার চোখের মধ্যে কী যেন ধক ধক করে।

আদ্যিকালের কাঠের চেয়ারে কবেকার পুরোনো ছোবড়ার গদি পাতা, পা তুলে বসা হরকালী। গায়ে একখানা ফতুয়া, পরনে সেই সনাতন হেঁটো ধুতি। জ্যাঠার ধুতি কোনোদিনই পায়ের পাতা অবধি নামেনি। খুব ভদ্রস্থ হলে হাঁটুর এক বিঘৎ নিচে। আর চওড়া দক্ষিণের বারান্দায় ওই চেয়ারখানা। সেই শিশু বয়স থেকে দেখে আসছে যীশু। জ্যাঠার চেয়ার। সামনে চোখ ধাঁধানো এক পান্নার খনি। কেউ আর এখন বাগানের পিছনে খাটে না বলে কয়েক বিঘা জমি জুড়ে কী উল্লাসে গজিয়ে উঠেছে লতাপাতা, ঘাস আর গাছ। রৌদ্রে তপ্ত গাছপালা থেকে একটা বন্য সুঘ্রাণ আসে। কদম গাছের তলায় কত ফুল পড়ে পড়ে বিছানার মতো হয়ে গেছে, এখনো গাছ ভরা ফুল।

হরকালী মুখের হরীতকী জিব দিয়ে একটু নেড়ে বললেন, সে কি ভয় পায় তোমাকে বাপা?

কদম ফুলের রোঁয়া তুলে ন্যাড়া করে নিলেই একখানা ছোটো সবজে বল। তাই দিয়ে কত লোফালুফি, আর ওই কলকে ফুলেব গাছ। ফুল ছিঁড়ে বোঁটায় মুখ দিয়ে টানলেই আধফোঁটা মধু জিবে চলে আসত। বাগানটার দিকে চেয়ে যীশু একটু শ্রান্ত গলায় বলল, ভীষণ, বাঘ দেখলেও মানুষের আতঙ্ক হয় না।

কেন বাপা, তুমি কি তাকে মারিছ?

যীশু মাথা নাড়ল, না জ্যাঠা, মারব কেন?

বউ স্বামীকে ভয় খায় কেন বাপ? এত ভয় কিসের?

কি করে বলি? তার মনটাই বুঝে উঠতে পারলাম না কিনা।

সে এখন কোথায়?

বাপের বাড়ি।

বাপা, খোলসা হও। একটা কারো কাছে খোলসা হওয়া ভাল। একটু বুঝে দেখি, বিষয়খানা কী।

বারান্দায় খোলা পূর্বদিকে চওড়া রোদের টুকরো পড়ে আছে। চকচকে বারান্দা ঝিলমিল করছে রোদে। রোদটার দিকে একটু চেয়ে রইল যীশু। জ্যাঠা কি সব বুঝবে? যীশু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বলার মতো কিছু খুঁজে পাই না জ্যাঠা। তার ধারণা আমি তাকে ঘুমের মধ্যে গলা টিপে মেরে ফেলব। সেই ভয়ে অনিদ্রা ধরল। খাবারে বিষ মিশিয়ে দেব ভয়ে খাওয়ার আগে বেড়াল আর কাকপক্ষীকে খাইয়ে দেখত। শেষে এমন হল....

বাপা, তুমি আমার দিকে চায়ে কথা কও। অন্য দিকি মুখ ঘুরায়ে রাখলে আমি সব কথা বুঝবের পারি না।

যীশু তার জলচৌকিখানা একটু ঘুরিয়ে নিল। হাসলও একটু। বলল, সারাদিন চোরডাকাত গুণ্ডা বদমাশদের পিছনে ধাওয়া করি জ্যাঠা। আমার কি আর বউয়ের মন বুঝবার সময় হয়? যখন বাড়ি ফেরি তখন লক্ষ করি, আমাকে দেখলেই বকুল যেন নীলবর্ণ হয়ে যায়।

কখনো জিজ্ঞেস কর নাই কেন অমন করে।

করেছি, কিছু তেমন বলে না। বিয়ের পর মাত্র এক বছর সবে হল। এত অল্প সময়ে আমি মেয়েটাকে ঠিক মতো বুঝতে পারলাম না। তবে ওই আপনি যা বললেন, বকুলও তা বলত। আমার নাকি খুনী-খুনী চোখ। জ্যাঠা, আমি চোখ দুখানা এখন কোথায় লুকোবো?

হরকালী হরীতকীটা একগাল থেকে আর এক গালে নিয়ে বললেন, তা এখন কি তোমার ছুটি?

যীশু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, একরকম ছুটিই।

শোনো বাপ, ওই পাঁচু নাপতে আমাকে খেউরি করতে আসছে। বড় পেট-পাতলা লোক। পাঁচজনকে কয়ে বেড়াবেনে, ওর সামনে এসব কথা কওয়ার দরকার নেই।

আধবুড়ো পাঁচু এসে তার যন্ত্রের বাক্স আর কথার ঝাঁপি খুলে বসে গেল। পাথরে জল দিয়ে ক্ষুর শানাবে অনেকক্ষণ আর সকলের হাঁড়ির খবর বিস্তারিত বলবে।

যীশু উঠে পড়ল।

রান্নাঘরে কয়লার উনুনের সামনে বউদি বসে কড়াইতে একটা ঘোঁট পাকাচ্ছে। লাভলি বসে রুটি বা লুচি জাতীয় কিছু বেলছে।

বউদি মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে বলল, পিঁড়িটা পেতে দে তো লাডু। কাকাকে বসতে দে।

যীশু বসল।

শ্বশুরমশাই বকুলের কথা জিজ্ঞেস করছিল নাকি?

কী করে বুঝলে?

বউদি বাসন্তী একটু হেসে বলে, আড়ি পেতে একটু শুনছিলাম। তুমি উঠতেই ধেয়ে পালিয়ে এসেছি।

আর এসে দিব্যি ভালমানুষের মতো মুখ করে খুন্তি নাড়া দিচ্ছো। মেয়েমানুষেরা পারেও বটে।

মাইরি না, মোটেই আড়ি পাততে যাইনি। চিনি আনতে ঘরে গিয়ে কপাটের আড়াল থেকে একটু শুনে এলাম। তোমার চোখের মধ্যে কী ছাইভস্ম আছে বলছিলে?

কেন, তুমি দেখতে পাও না?

ওমা, তোমার চোখ তো দিব্যি দেখছি বাপু। ওসব ঢঙ্গি আর ন্যাকা মেয়েছেলেদের কথা আর বোলো না। কত কিছু বানিয়ে নেয়।

যীশু দেখল, লাভলি লুচি বেলা থামিয়ে তার দিকে চেয়ে আছে।

তুই কিছু দেখতে পাস আমার চোখে?

তোমার চোখ! তোমার চোখ তো একদম গরুর মতো।

যীশু খুব হেসে উঠল। বাসন্তী মেয়েকে ধমক দিয়ে বলল, যাঃ, কাকা গুরুজন না? ওরকম বলতে আছে?

লাভলি লুচি বেলতে বেলতে বলল, তুমি কখনো ভাল করে গরুর চোখ দেখনি মা। গরুর চোখ কিন্তু ভারী সুন্দর। টানা টানা, কাজল পরানো, শান্ত, ঠাণ্ডা।

তোকে আর কাব্যি করতে হবে না তো ? কখানা বেললি ? ঘন্টাটাকের চেষ্টায় মোটে আটখানা ? তাড়াতাড়ি হাত চালা তো হাঁ-করা মেয়ে। আর ও কখানা দে, ভেজে দিই। ছেঁচকিটা হয়ে গেছে।

যীশুর এখন খাবারদাবারের প্রতি কোনো আগ্রহ নেই। কিছু বলতে হয় বলে বলল, কিসের ছেঁচকি বউদি ?

কুমড়ো ছেঁচকি। সকালে রোজ তাই করি।

কুমড়ো খেলে কুষ্ঠ হয়।

ওম্মা গো। যাঃ, আমরা রোজ কাঁড়ি কাঁড়ি খাচ্ছি, কুষ্ঠ হয় বললেই হল।

কথাটা আমার দাদু বলত।

রাখো তো বুড়োমানুষদের কথা। বাগানের উত্তর দিকে গিয়ে দেখো মাটিতে গাছ লতিয়ে গেছে আর জম্বুবানের মতো সব কুমড়ো গড়াচ্ছে ঘাসের ওপর। কী করব, ফেলে তো আর দিতে পারি না।

বেচলে পারো।

কে কিনবে ? এ কি কলকাতা ? তা ছাড়া শ্বশুরমশাই আবার বেশি ব্যবসা বুদ্ধি পছন্দ করেন না। তোমাকে তাহলে বরং একটু আলু ভেজে দিই।

আরে দূর। ঠাট্টা করছিলাম। কুমড়ো খেলে কুষ্ঠ হয় এটা কোনো কথা নাকি ? দাও, ছেঁচকির গন্ধটা বেশ ভালই ছেড়েছো।

পাও তাহলে গন্ধবাল্প ? যা গোমড়া মুখে থাকো। আমরা ভেবে মরি, পুলিশ সাহেবের হলটা কী ? বিয়ের পর বউ নিয়ে এসে সেই যে দু রাত্তির কাটিয়ে গেলে তারপর এই এতদিন পর এলে। তাও থমথমে মুখ আর—

আর কী ? ধকধকে চোখ ?

যাঃ।

যীশু মৃদু একটু হাসল।

বাসন্তী বউদি লুচি ভেজে কাঁসার থালায় এগিয়ে দিয়ে বলল, তোমার দাদাও ভারী চিন্তা করছে তোমার জন্য। কাল রাতেও বলছিল, যীশুটার কী যে হল, মুখ দেখে কিছু জিজ্ঞেস করতেও ভরসা হয় না।

যীশু খুব আনমনে লুচি কামড়াতে কামড়াতে প্রকাণ্ড রান্নাঘরটা ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। প্রায় হলঘরের মতো বড়। চার পাঁচটা বড় বড় জানালা আছে। সব কটা দিয়েই বাইরের সবুজ সতেজ গাছপালা উঁকি দিচ্ছে। পাখি-পক্ষী চলে আসে অনায়াসে।

বউয়ের কথা শ্বশুরমশাইকে সব বললে ?

যীশু মাথা নেড়ে বলল, কীই বা বলার আছে।

ও তোমাকে কেন ভয় পায় ?

বলবে কিনা তা একটু ভাবল যীশু। তারপর একবার লাভলির দিকে চেয়ে বলল, তুই হাঁ করে চেয়ে আছিস কেন রে ? কথা গিলবি বুঝি ?

আমার শুনতে নেই বুঝি ? আচ্ছা বাবা যাচ্ছি। এই যে মা, বাবার রুটি বেলে রেখে গেলাম। বেলিদের বাড়িতে যাচ্ছি।

ফ্রকে এখনও ওকে মানায় বটে, কিন্তু লাভলিটা বড় হয়েছে। সতেজ পায়ে একটা লাফে উঠোনে পড়ল তারপর মাটি কাঁপিয়ে দুড়দাড় দৌড়ে পালিয়ে গেল। একটা হলদে কুকুর দরজায় দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছিল এতক্ষণ, সেটাও দৌড়োলো ওর পিছু পিছু।

এবার বলো তো ? তোমার দাদা আবার খেতে আসবে।

যীশু হাতঘড়ি দেখে বলল, এখন তো মোটে সকাল আটটা, এখনই খাবে কী ? স্কুল তো এগারোটায়।

আহা উনি বুঝি শুধু হেডমাস্টারি করেন। পলিটিক্স আছে না ? দলবল নিয়ে ঘোঁট পাকানো। নটায় বেরিয়ে সেই টিফিনে এসে ভাত খেয়ে ফের ইস্কুল। তারপর তোমার কথা বলো।

যীশু কেমন যেন ক্লান্ত বোধ করছিল। বড় হতাশ লাগে আজকাল। কিছু বলতে-কইতে ইচ্ছে করে না। দমটা একটু ধরে রেখে বলল, আমি তো সাব ইন্সপেক্টর। আমাকে তো অ্যাকশনে নামতেই হবে, নাকি ?

তা তো বটেই ?

অনেক সময়ে ইচ্ছে না থাকলেও গুলি চালাতে হয় বউদি। বাধ্য হয়ে, খুন করায় তো আনন্দ নেই। কিন্তু সিচুয়েশন এমন হয় যে, উপায় থাকে না। তিনটে আমার হাতে গেছে। তিনটেই ভীষণ খারাপ লোক। মেরেছি বলে আমার আজ কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু বকুল কেন যে সেগুলোকে অন্যভাবে ধরে বসল।

ওমা, পুলিশের বউরা কি স্বামীর ঘর করছে না নাকি ?

সেই তো কথা।

চাকরি করতে গেলে কত কী করতে হয়।

তুমি তো আমার পক্ষ নিলে, কিন্তু বকুল ভাবল—কী ভাবল তা কে বলবে বল। একদিন হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে আলো জ্বলছে, দেখি, বকুল আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। যে চোখ দেখলে গা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আর ভয়ে এমন শক্ত মেরে গিয়েছিল যে আমি ডাক্তার ডাকলাম। বিয়ের দুমাসের ভিতরেই এই ঘটনা।

পাগল নাকি ?

পাগল না হলেও খুব দুর্বল মনের মেয়ে। এদের বাস পাগলামির সীমানায়। মাঝে মাঝেই আমাকে জিজ্ঞেস করত, বাপের বাড়ি যাই? কখনও বা বলত, আমার মাকে ক'দিন এনে রাখবো? আমি আপত্তি করিনি। তখন কি ছাই জানি যে বাপের বাড়ি যেতে চায় আমার হাত থেকে পালানোর জন্য, আর মাকে আনতে চায় পাহারাদারি করতে।

কী মুস্কিল তোমার ভাই।

যীশু একটু হাসল, বকুল সব গণ্ডগোল করে দিল বউদি। সে ছেড়ে গেছে বলে নয়। গেছে, আমিও বেঁচেছি। কিন্তু ওই যে ওর সন্দেহ, আমি ওকে খুন করব, সেটা ও ওর বাপের বাড়ির সবাইকে বুঝিয়ে ছেড়েছে। আর আমার মধ্যেও শেষ দিকে—কি জানি কেন—

যীশু আর বলতে পারল না, ভীষণ আনমনা হয়ে চেয়ে রইল দরজা দিয়ে বাইরে। উঠোনে রোদ লুটোপুটি খাচ্ছে। নিমপাতার চিকড়ি মিকড়ি ছায়ায় তিড়িক তিড়িক লাফিয়ে বেড়াচ্ছে শালিখ, একটা, দুটো, চারটে।

যীশু খাবার ফেলে উঠে পড়ল।

ওমা, খেলে না?

ইচ্ছে করছে না।

বাসন্তী আর দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করার সাহস পেল না, যীশু হয়তো কোনোদিনই জানবে না, বাসন্তীও তার চোখে ওই ধকধকে কিছু একটা দেখতে পেল এখন।

বাইরের দিকে আলগা একটেরে একটা ঘর আছে। চণ্ডীমণ্ডপ বলা ঠিক হবে না, কিন্তু মাতব্বরেরা আজকাল সকাল-বিকেল এখানেই জড়ো হয়। আর তাদের একজন চাঁই হল যীশুর জ্যাঠতুতো দাদা পরেশ। গুঁফো, কালো, থলথলে এবং পুরোপুরি গেঁয়ো চেহারার এই লোকটি কিন্তু একটু বিচ্ছু টাইপের। ঘেঁটি পাকাতে এবং একে ওকে কাঠি দিয়ে বেড়াতে তার জুড়ি নেই। এম এল এ হওয়ার একটা দুরন্ত ইচ্ছে বহুকাল ধরে লোকটাকে নাকাল করে মারছে।

ঘরটার কাছাকাছি যেতেই যীশু বেশ উচ্চকণ্ঠ আলাপ-আলোচনা শুনতে পেল। তাই আর এগোলো না। সে যে পুলিশ এবং বেশ জবরদস্ত পুলিশ এটা সবাই জানে। তাকে দেখে সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, এটাও সে লক্ষ করেছে। গোটা চার পাঁচ সাইকেল কাঠিতে ভর দিয়ে হেলে দাঁড়ানো, চাকার ছায়া পড়েছে। গাছের ছায়া, বেড়ার ছায়া, উড়ন্ত পাখির ছায়া। কত বস্তুতে বাধা পেয়ে কত খণ্ডে ফালি ফালি হয়ে কত আকারের আলো পড়ে আছে চারধারে। শরৎ এল বলে। আকাশে এখনো মেঘ আসছে, যাচ্ছে। বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে ঝুমঝুম

করে। আবার ভেসে উঠছে ধোয়া মোছা আকাশ।

এরা কেবল বকুলের কথা জানতে চায়। বকুলের কথা আর কীই বা বলতে পারে যীশু ? বকুল তার সমস্যা নয়। ছেলেপুলে হলেও বা কথা ছিল। বকুলের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই তো গড়ে উঠল না। তবে তার চলে যাও যীশুর একরকম পরাজয়। সেই পরাজয়টা যীশু তেমন অনুভব করে না। তবে ঘটনা সেখানেই থেমে থাকেনি। আর একটু গড়িয়েছে। অন্য দিকে।

আচমকাই দাদাকে দেখতে পেল যীশু। সভা ভেঙে বেরিয়ে আসছে।

দাদা।

কী রে ?

আজ এবেলা একটু কলকাতা যেতে হচ্ছে।

তা যা না।

সাইকেল তো একটা, তোমার লাগবে।

আরে ধুস ! সাইকেলের কি অভাব নাকি ! হাঁক মারলে দশটা সাইকেল এসে পড়বে। নিয়ে যা। এবেলাই ফিরবি তো ?

হ্যাঁ। হাওড়া স্টেশন থেকেই ফিরে আসব।

যা তাহলে বেরিয়ে পড়। আটটা বাহান্নর ট্রেনটা যদি পাস ভাল, নাহলে ন'টা পাঁচ পেয়ে যাবিই। সাইকেলটা বৈরাগীর দোকানে রেখে যাস।

পরেশের দলবল, অর্থাৎ মাতব্বরেরা সব তাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেছে। বেশ একটু সম্ভ্রমের ভাব, মুখে দেঁতো হাসি। পুলিশ সাহেব বলে কথা। এ গাঁয়েরই ছেলে বলতে গেলে, এখন কলকাতার বড় বড় চোর গুণ্ডাকে দাবড়ে বেড়ায়। সোজা কথা।

সবাই আশা করছিল যীশু তাদের সঙ্গে একটু কথা বলবে। অনেকেই তার চেনা। বিশেষ যোগাযোগ নেই, এই যা।

সবাই আশা করছিল বটে, কিন্তু যীশুর কিন্তু মনেই হল না যে, এদের সঙ্গে ভদ্রতাসূচক সামান্য কুশল বিনিময় করাটা তার উচিত। সে মুখ ঘুরিয়ে চলে এল ভিতরে। দু মিনিটে পোশাক পরে নিল। তারপর সাইকেলটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বড়বাবু, আমি যীশু বলছি।

যীশু ! আরে বলো কি ? তুমি কি শেষে অ্যাবসকণ্ডার হলে নাকি ?

না স্যার, গাঁয়ের বাড়িতে আছি। রেস্ট নিচ্ছি।

যে কোনো সময়ে তোমাকে ইন্টেরোগেট করতে লালবাজারের লোক আসবে,

তা জানো ? আণ্ডার সাসপেনসন হলেও তোমার এগেনস্টে তো মারাত্মক চার্জ আছে। তোমার উচিত ছিল প্রত্যেক দিন একবার আমার কাছে রিপোর্ট করা। না হলে অ্যাবসকণ্ডার হিসেবে হুলিয়া দিতে হয়।

ইন্টোরাগেশন তো হয়ে গেছে।

একবারেই কি হয় ? অন্তত তিন চার খেপ লাগতে পারে। এখন কোথা থেকে ফোন করছো ?

হাওড়া স্টেশন। এখান থেকেই বাড়ি ফিরে যাবো। আমার এগেনস্টে আপনার রিপোর্ট কী স্যার ? খারাপ !

যীশু, ইন ফ্যাক্ট তুমি আমার অ্যাসেট ছিলে। মোস্ট অ্যাজাইল, কারেজিয়াস, অ্যাকটিভ অফিসার। কিন্তু তোমার সব কিছুতেই কি একটু বাড়াবাড়ি ছিল না ? একসেস কখনোই ভাল নয়। চাকরিটা চাকরির মতোই করতে হয়, তাতে জান লড়িয়ে দিতে নেই। তোমার বয়স কত হল বল তো ? চব্বিশ-পঁচিশ ?

ছাব্বিশ স্যার। ছাব্বিশ প্লাস।

প্রাইস অফ ইয়ুথ। একেবারে উঠবার মুখে কাণ্ডটা করে ফেললে। কী যে হবে।

আপনার রিপোর্টটা কি খুবই খারাপ স্যার ?

বড়বাবু এবার একটু হাসলেন, যীশু, তুমি কি জানো যে আমি ফিলজফির এম এ ?

নিঃশব্দে একটু হাসল যীশু। সে জানে। থানার সবাই জানে। বড়বাবুর কাছে দিনে বত্রিশবার তাদের শুনতে হয় খবরটা।

জানি স্যার।

আই টেক লাইফ ভেরি ফিলজফিক্যালি। আমার রিপোর্ট তোমার এগেনস্টেও না, ফর-এও না। টু টু দি ফ্যাক্ট। ঘটনাটা তো আমি চোখে দেখিনি।

কোনো পোলিটিক্যাল প্রেসার কি আসছে স্যার ?

বড়বাবু একটু যেন সময় নিলেন। তারপর চিন্তিত গলায় বললেন, এখনো পর্যন্ত তেমন কিছু মনে হচ্ছে না। তবে খবরের কাগজে উঠেছে, তুমি তো জানোই। নাউ ইট ইজ পাবলিক নিউজ।

কাগজে তো আমার নাম দেয়নি স্যার।

দেবে। পোলিটিক্যাল প্রেসার যে আসবে না তা বলতে পারি না, ওই মেয়েটা তো তার স্বামীর জন্য লড়ে যাচ্ছে। যতদূর পারে করবে।

জানি স্যার।

শুনেছি খবরের কাগজ, লালবাজার, মন্ত্রী, এম এল এ কারো কাছে গিয়ে ধর্না দিতে বাকি রাখছে না। তোমার নাম ও সবাইকেই বলেছে। সুতরাং নাম বেরোতে দেরি হবে না। প্রেসারও আসবে।

মেয়েটা যে এসব করবে সেটা আমি জানতাম স্যার।

জানতে ? বলে বড়বাবু একটু চুপ করে রইলেন। তারপর গলাটা সামান্য নামিয়ে বললেন, কেসটা কী ? তোমার সঙ্গে লাভ অ্যাফেয়ার ট্যাফেয়ার ছিল নাকি ? দাগা দিয়েছিলে বলে এখন শোধ তুলছে ?

না স্যার। ওসব হিন্দী সিনেমায় হয়। মেয়েটা আমার বাঁ গাল নখে ছিঁড়ে দিয়েছিল। আপনি আমাকে লক-আপ-এ রাখেননি বলে আপনাকেও যাচ্ছেতাই অপমান করেছিল। সেদিনই বুঝেছিলাম অনেকদূর গড়াবে। মেয়েরা যখন খ্যাপে তখন হাণ্ড্রেড পারসেন্ট চামুণ্ডা।

মেয়েদের নিয়ে তোমার প্রবলেমের এখানেই তো শেষ নয়। তোমার বউ বকুল আর তোমার শ্বশুর চন্দ্রনাথবাবু একদিন এসেছিলেন। তারা তোমার সম্পর্কে ইনফর্মেশন চান।

কিরকম ইনফর্মেশন ?

তুমি কিরকম লোক, কতদূর বিশ্বাসযোগ্য।

তারা কি ডায়েরি করতে চায় ?

সেরকম তো বলেনি। শোনো, কোনো কারণেই অ্যাবসকণ্ড কোরো না। যে কোনো মোমেন্টে ওয়ারেন্ট ইসু হতে পারে। এনকোয়ারি চলছে বটে, তবে পুলিশের ব্যাপারে পুলিশ একটু সিমপ্যাথটিক হয়ই। আফটার অল ডিপার্টমেন্টের দুর্নাম তো। তোমার দেশের বাড়ির ঠিকানাটা বল, আর নিয়ারেস্ট থানা।

যীশু বলল।

তুমি সার্ভিস রিভলভারটা জমা দিয়ে গেছ তো!

হ্যাঁ স্যার। আমার রসিদ আছে।

ঠিক আছে। ইন দি মিন টাইম, পুলিশ ইউনিফর্ম ব্যবহার কোরো না। ডু নাথিং। লিভ এ ক্লিন প্লেন লাইফ। এভরিথিং উইল বি ও কে।

যীশু নিঃশব্দে আবার হাসল। বলল, না স্যার, কিছুই আর আগের মতো হবে না। দুনিয়া পাল্টে যাচ্ছে আমার। ছাড়লাম স্যার।

টেলিফোনের খুপরি থেকে বেরিয়ে এসে প্যান্টের পকেটে হাত ভরে অনেকক্ষণ টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যীশু। অনেকক্ষণ সে চুপচাপ দাঁড়িয়েই রইল। কী করবে তা বুঝতে পারল না যেন। তারপর ধীর পদক্ষেপে বিশাল

চত্বরটা পার হয়ে এক নম্বর গেট-এর কাছে চলে এল।

এইখানে আগে গণশা মোতায়েন থাকত। পুলিশের মস্ত কন্ট্যাক্ট। রোগা, লুঙ্গি পরা, বিড়ি ফোঁকা দাঁত উঁচু গণশা। গলায় সবুজ রুমাল তার থাকবেই। কখনো চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলত না।

আজ পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়েও গণশার চিহ্ন দেখতে পেল না যীশু। গণশা না থাক তার দলের কেউ থাকার কথা। যীশুকে তারা চেনে। একবার এসে কুশল প্রশ্ন করবে না, এ কি হয়? নাকি কনডেমড পুলিশ অফিসার হিসেবে তার অখ্যাতি এদের কাছেও পৌঁছে গেছে?

দশ মিনিটের মাথায় হতাশ যীশু টিকিট কাউন্টারে গিয়ে ফেরার টিকিট কাটল। কুড়ি মিনিট বাদে গাড়ি। যীশু বাইরে এসে গঙ্গা আর ওপারের কলকাতার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, কী অসহনীয়, কী গিজগিজে, কী গাদাগাদি একটা শহর। সবুজ সুঘ্রাণ এক পরিবেশ ছেড়ে এলে কী ঘেন্নাই না হয়?

কখন নিঃশব্দে একটা পায়জামা পরা ছোকরা এসে পাশে দাঁড়িয়ে গেছে, টের পায়নি যীশু, হঠাৎ পেল, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই ছেলেটা ডান হাতটা কপালে তুলে একটা অভিবাদন গোছের করে বলল, গণশার চোট হয়েছে স্যার। হাসপাতালে।

যীশু মুখ ফিরিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে হাঁটতে লাগল। পুলিশ প্যারেডে যেমন হাঁটত অবিকল সেইভাবে। লেফট রাইট লেফট রাইট...আর আশ্চর্যের বিষয় হঠাৎ তার একটা ছড়া মনে এল, লিখিব পড়িব মরিব দুখে মৎস্য মারিব খাইব সুখে। বাঃ দিব্যি মিলে যাচ্ছে। লেফট রাইট লেফট রাইট লিখিব পড়িব মরিব দুখে মৎস্য মারিব খাইব সুখে... লেফট রাইট লেফট রাইট...

গাড়ির কামরায় একটা লোক একটু সিঁটিয়ে গেল না তাকে দেখে? যীশু ভাল করে লোকটাকে দেখল। না, এ মুখ সে জন্মেও দেখেনি। মুখ সে সাঙ্ঘাতিক চেনে, একবার দেখলেই বহুদিন মনে থাকে। এ লোকটা নিতান্তই একটা এলেবেলে মার্কা লোক। ভালও হতে পারে, মন্দও। তবে এরা মাঝারি ভাল বা মাঝারি মন্দ।

যীশু সীটে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজে রইল। মাথা থেকে সব চিন্তা তাড়িয়ে দেওয়ার একটা অক্ষম চেষ্টা করল সে। পারল না।

পঞ্চাননতলা আর গোবিন্দপুরের মস্তানদের মধ্যে আগে একটা বছরওয়ারি বোমাবাজি চলত। এলাকা দখল ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই। পুলিশের কিছু করার ছিল না, শুধু ওয়াচ রাখা ছাড়া, যাতে সিভিলিয়ানদের গায়ে হাত না পড়ে। সেই দলের ইনচার্জ ছিল যীশু। ঢাকুরিয়া ফ্লাইওভারের একটু পুবদিকে,

ঝুপড়ির ধার ঘেঁসে সে দাঁড়ালো। দুপাশে কয়েকজন কনস্টেবল। এপাশ ওপাশ থেকে গলি ঘুপচির পথ চেয়ে কালো কালো ছোকরা হঠাৎ বেরিয়ে এসে বোমা ছুঁড়েই উধাও হচ্ছে। চারদিক থম থম করছে আতঙ্কে। হঠাৎই একটা বছর পাঁচেকের বাচ্চা কোন ফাঁকে বেরিয়ে এসেছিল ঝুপড়ি থেকে। পিছনে রে রে করে তার বাপ। পঞ্চাননতলার দিক থেকে সবুজ জামা পরা একটা ছোকরাকে কয়েকবারই বেরিয়ে এসে বোমা মারতে দেখেছে যীশু। এবারও সে বেরোলো এবং বিবেকহীন বোমটা মেরে পালাল। বাচ্চাটা বাপের তাড়া খেয়ে ঘরে ফিরছিল, বেঁচে গেল। বাপটা পারল না। মাথাটা যীশুর চোখের সামনেই ফেটে খাঁ হয়ে গেল। অগ্র-পশ্চাৎ সেদিন যীশুও বিবেচনা করেনি। লাইন পেরিয়ে তড়িৎগতিতে সে ধাওয়া করল। পিছন থেকে কনস্টেবলরা চেঁচাচ্ছিল, যাবেন না স্যার, যাবেন না। কিন্তু তখন যীশু অন্য যীশু। পঞ্চাননতলার পাকচক্রে ঢুকে সে কোমর থেকে রিভলভারটা টেনে নিল। সবুজ জামা বেশি দূর যায়নি। সবে একটা মোড় ঘুরে সরু একটা জায়গায় ঢুকেছে। দু সেকেণ্ড দেরি হলেই ছোকরা হাপিশ হয়ে যেত। যীশু সেই দু সেকেণ্ড দেরী করেনি। দুখানা ফুটো দিয়ে প্রাণবায়ু বের করে দিল তার। পরে জানা গেল, সে কুখ্যাত দুলে। কোনো কেস হয়নি, কেউ সাধুবাদও দেয়নি। তবু ওই তার প্রথম খুন বা আইনের ভাষায় অন্য কিছু।

দ্বিতীয়জন রাজনৈতিক উগ্রপন্থী। একটু বেশি উগ্র এই যা। অনেকগুলো খুনের মামলা গলায় মালার মতো ঝুলিয়ে দিব্যি পালিয়ে ছিল এতদিন। খবর পাওয়া গেল, সে অমুক জায়গায় আছে। সেই জায়গা গিয়ে ঘিরে ফেলল যীশু। কিন্তু চেঁচিয়ে সারেণ্ডার করতে বলার আগেই স্টেনগান বেরিয়ে এল জানালা দিয়ে। ধুন্ধুমার-গুলি চলল উভয় পক্ষে। যীশু প্রকাশ্য গুলি-বিনিময়ে গেল না। সোজা গিয়ে পিছনে একটা বাথরুমের দরজা লাথি মেরে ভেঙে ঢুকে পড়ল ভিতরে। লোকটা স্টেনগানের নল ঘুরিয়েছিল বটে, কিন্তু সেকেণ্ডর ভগ্নাংশ দেরি করেছিল। যীশুর উপায় ছিল না, গুলি চালানো ছাড়া।

তৃতীয় জন এক অবিশেষ লোক। একটা দাঙ্গা থামাতে গুলি চালিয়েছিল পুলিশ। যীশু জানে, পুলিশের রাইফেলের গুলিতে দুজন আর তার রিভলভারের গুলিতে একজন মারা যায়। তিন জনের হাতেই পাইপ গান আর বোমা ছিল।

কিন্তু চতুর্থজন! এই চতুর্থজনকে নিয়েই যীশুর যত মুস্কিল।

এই চার নম্বরটাকে নেওয়া তার ঠিক হয়নি। এতটা অবিবেচক সে নয়ও। সে ডকে তুলে দিতে পারত, কেসটা স্ট্রং করে সাজাতে পারত। সাক্ষী সাবুদ ছিল। সাজা হতই। তবু কী যে হল....

॥ দুই ॥

বিয়ের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে কমল। সঙ্গে অনিচ্ছুক বাবা আর আগ্রহী দাদা। বিধবার বেশ ধারণ করার কোনো দরকার ছিল না কমলের। আজকাল আর এত উগ্র বিধবা কেউ সাজে না। একেবারে নিখাদ থান, আভরণহীন হাত, সাদা সিঁথি। গলায় একটা সরু সোনার চেন, কানে দুটো টপ। এলো খোঁপা, তার ওপর তোলা আলতো ঘোমটা। তেইশ বছরের মেয়ের এই বেশ তাকে মিইয়ে দিতে পারত। উল্টে থানের সাজে কমলের রূপ যেন শতগুণে ফেটে পড়ল। ধক ধক করছে যৌবন। সাঙ্ঘাতিক। বিস্ফোরক।

কমল অবশ্য তা জানে না। সে নিজের শোকে বিভোর। দশ পা দূরে ছিল জীবনের এক মোহময়, অনেক কল্পনার এক আল্পনা আঁকা পিঁড়ি। ছিল সখীদের সহর্ষ দেয়াল ঘেরা একটা রূপকথার বৃত্ত, যেখানে শুভদৃষ্টি হবে। বর বরণ হয়ে গেছে। তারা সেই পরম মুহূর্তের দিকে যাচ্ছে। যেতে যেতে থেমে যেতে হল।

দরজার কাচ নামিয়ে দিয়ে দাদা বলল, ওরা কিন্তু গাঁইগুঁই করতে পারে।

কমল অবাক হয়ে বলল, কারা?

তোর শ্বশুরবাড়ির লোক। অজয় মরার পর উঁকিও তো দিতে আসেনি কেউ।

ওদেরও তো শোকতাপ চলছে।

তা চলছে। তবু তোর দিকটাও তো দেখবে। অজয়ের ভাই-টাইগুলো অন্তত আসতে পারত।

কমল কী বলবে। ক্লান্তিতে চোখ বুজে রইল।

তার দাদা অর্ধেন্দু তাকে বোঝাতে লাগল, তুই কিন্তু হাল ছাড়বি না। লেগে থাকবি। তারা গাঁই গুঁই করলেও পিছোবি না।

কমল কথাটা বুঝতেই পারছিল না। কিসের গাঁই গুঁই? কেন গাঁই গুঁই? বিরক্ত হয়ে সে বলল, চুপ কর তো দাদা। আমার মন ভাল লাগছে না। মনে রাখবি, আমি প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি, আর এই বেশে।

অর্ধেন্দু মিন মিন করে বলল, সেই কথাই তো বলছি।

আর বলিস না।

বাবা ইন্দ্রনাথ কিছুই বললেন না, খুব ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

পথ এতই সামান্য যে, ইন্দ্রনাথের তেত্রিশ নম্বর দীর্ঘশ্বাসের মাথায় ট্যাক্সি কমলের শ্বশুরবাড়ির দরজায় গিয়ে থামল। কসবার একটু মধ্যবিত্ত পাড়ায় ছিমছাম একটা বাড়ি। অর্ধেন্দু গিয়ে কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দাঁড়াল একটা

ঝি।

কাকে চাই ?

বলো গে বউদিমণি এসেছেন।

কথাটা দ্রুত চাউর হয়ে গেল বাড়িতে। তারা তিনজন সবে বাইরের ঘরে ঢুকেছে, ভাল করে বসেওনি, কোথা থেকে তিন তিনটে দরজা দিয়ে জনা সাত আট মেয়ে পুরুষ ঘরে এসে ঢুকল।

কারও মুখে মিনিটখানেক কথা ছিল না। তারপর কমলের এক ননদ বলে উঠল, ওকে বিধবার পোশাক পরিয়েছেন কেন আপনারা ? ও তো বিধবা নয়।

একথায় কমল মুখ তুলল, তার চোখ ভরা জল। সে মেয়েটিকে ভাল করে দেখতেও পেল না।

অর্ধেন্দুই জবাব দিল, বিধবা নয় কেন ?

চারদিকে একটা গুঞ্জন শুনতে পেল কমল। তার বরণ উলুধ্বনি আর শঙ্খের আওয়াজ দিয়ে তো হল না। কিন্তু এও এক ধরনের আওয়াজ। বরণের কি ?

শাশুড়িই বোধহয় ধরা গলায় বললেন, কাজটা আপনারা ঠিক করেননি। বিয়ের মন্ত্রপাঠ হয়নি, সাত পাক হয়নি, তাকে বিয়ে ধরবেন কী করে ? মেয়ে লগ্নভ্রষ্টা হয়েছে, এই পর্যন্ত, বিধবা নয়।

কমল চোখ মুছল। চারদিকে একবার চেয়ে মুখগুলি দেখল। বন্ধুর মুখ বলে মনে হল না।

মুখ নিচু করে নরম গলায় বলল, যাকে বরণ করে নিয়েছিলাম মনে মনে সে বর ছাড়া আর কী ?

মুখরা ননদটি হঠাৎ বলে উঠল, ঢং-এর কথা শুনে আর বাঁচি না। তার সঙ্গে তো তোমার চোখাচোখিটুকুও হয়নি। মনে মনে বরণ করলেই হল ? ওরকম বরণ বিয়ে ছাড়াও অনেকেই করে, তাই বলে সেটাকেও বিয়ে বলে ধরতে হবে নাকি ?

অর্ধেন্দু কী একটা বলার চেষ্টা করছিল। অজয়ের কুখ্যাত গুণ্ডা ভাই বিজয় তার অস্বাভাবিক মোটা ও মন্ত্র গলায় বলল, দেখুন দাদা, বিধবা ফিদবা সাজিয়ে এনে লাভ হবে না। ওসব ঢপ আমাদের কাছে চলবেও না।

অজয়ের সবচেয়ে ছোটো ভাই একটু ভদ্র। বলল, ওসব কথা এখনই তোলার দরকার কী ? লেট দেম সে।

ননদ কিঙ্কিনী ভাইকে একটা ধমক দিয়ে বলল, তোর সব কথায় থাকবার দরকার কী ?

সে চুপ করে গেল।

ইন্দ্রনাথ মেয়ের পাশে চুপ করে বসে ছিলেন। এতক্ষণ কথা বলেননি। এবার বললেন, এ মেয়ের এখন ভবিষ্যৎ কী?

শাশুড়ি আর শ্বশুর প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলেন, আবার বিয়ে দিন। মেয়ে তো আর ফ্যালনা নয়।

তাই কি সম্ভব?

কেন সম্ভব হবে না? লগ্নভ্রষ্টা হয়েছে, সেটুকু আজকাল কেউ আর ধরে না।

অর্ধেন্দু সামান্য উত্তেজিত গলায় বলল, এটা আপনারা অন্যায় করছেন। অন্তত দেড়শ অতিথির সামনে বর বরণ হয়ে গিয়েছিল। বিয়ে প্রায় কমপ্লিট, এমন সময়—

বিজয় বলল, কোন আইনে হে বকাবাজ? আমরাও খোঁজ নিয়েছি। ওটা বিয়ে বলে ধরাই যায় না। বিধবাবাজি বেশি দেখাবেন না। সিন ক্রিয়েট করে পাবলিক ওপিনিয়ন ক্রিয়েট করবেন ওসব এখানে চলবে না। এটা আমার এলাকা। বদন বিলা করে দেবো।

ওখানেই কমল হঠাৎ এত দুঃখ অপমানের মধ্যেও বুঝতে পারল, তার শোক যত গভীর আর আন্তরিকই হোক, এরা তার অন্য একটা অর্থ করছে। সেই অর্থটাই সে জানতে চায়।

চোখ তুলে সে বিজয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি কী বলতে চান আমাকে বলুন। আমি কেন বিধবা সেজেছি?

জবাবটা কিঙ্কিনী দিল, কেন সেজেছো তা ভালই জানো। দাদার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা আর প্রেসের মালিকানা। ওসব চালাকি করে লাভ নেই। আমরা তোমাকে বাড়ির বউ বলে মেনে নেবো তত বোকা নই।

কমল তখন বুঝল। এদিকটা সে ভেবে দেখেনি। এই নির্মম সত্যটা তার চোখে পড়া উচিত ছিল। এক অচেনা মৃত ব্যক্তির বিধবা হয়ে থাকার মধ্যে যে ত্যাগের মহিমা সে অনুভব করেছিল তা তাহলে সত্য নয়।

মানুষ ভাবালুতার দাস। সেদিন অজয়ের রক্তে যখন রাঙা হয়ে গিয়েছিল কমল, যখন অজয়ের মাথা তার কোলে, আর লোকটা 'জল জল' করে ছটফট করছিল তখন একটা মঙ্গলঘট থেকে পিপাসার্ত মুখে জল ঢেলে দিতে দিতে কমল আকুল হয়ে বলে উঠেছিল, তুমিই আমার স্বামী। আমি তোমাকে বাঁচাবো। কোনো মানেই হয়না কথাটার। অজয়ের শরীর নিথর হয়ে গেল, মাথাটা ঢলে গেল একদিকে।

ভাবালুতার কি কিছু শেষ আছে? কমল রক্তমাখা অজয়ের আঙুল তুলে নিজের সিঁথিতে সেই রক্তের সিঁদুর পরে নিয়েছিল ডুকরে কাঁদতে কাঁদতেও।

এখন ভাবালুতা কেটে গেল তার। আসল চোখ খুলল।

সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বুঝেছি। আর আসব না।

বাবা আর দাদাকে নিয়ে অপমানিত কমল ফিরে এল নিজের বাপের বাড়িতে।

ট্যাক্সিতেই অর্ধেন্দু গজরাচ্ছিল, দেখে নেবো। আদালতে প্রমাণ করে ছাড়ব বিয়ে লেজিটিমেট কিনা।

বাড়িতে এসে অর্ধেন্দু একেবারে ফেটে পড়ল। তারপর দৌড়োদৌড়ি শুরু করল প্রথমে নানা পরামর্শদাতা ও পরে উকিলের কাছে।

কমল ধীরে ধীরে জানতে পারল। নানা আলোচনার সূত্র ধরে বুঝল মৃত অজয় অতিশয় সফল মানুষ। নিজে বেশ ভাল একটা চাকরি করত। যে প্রেসটা চালাত তারও আয় ভাল। অজয়ের বিধবা হিসেবে আইনত প্রমাণ হলে কমল বেশ মোটা টাকার উত্তরাধিকারিণী হবে। এই টাকাটার লোভ বাড়ির কেউ ছাড়তে পারছে না।

কিন্তু অজয়কে কে মারল, কেন মারল, তা নিয়ে যেন কারোই তেমন মাথাব্যথা নেই। পুলিশ তদন্ত করে গেছে। বিভিন্ন সাক্ষীর জবানি নিয়েছে। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। মৃত্যুটাকে কেউ যেন গুরুত্বই দিচ্ছে না।

তেইশ বছরের পিপাসার্ত ও ব্যর্থ যৌবন নিয়ে অজয়ের সেই বীভৎস মৃত্যুর কথা ভাবে শুধু বুঝি কমলই। সে সম্পূর্ণ বৈধব্য পালন করে, আলো চাল খায়, একাদশী অবধি করে।

ঘটনার দেড় মাস বাদে যখন সে বুঝল, বিষয়টা চাপা পড়ে যাবে তখন সে নিজেই এবং একা একা একদিন থানায় গিয়ে সেই তদন্তকারী অফিসারকে ধরল।

লোকটাকে কাজের লোক বলেই মনে হয়। শক্ত সমর্থ চেহারা, চোখে বুদ্ধির ঝিকিমিকি আর নির্ভীকতা, শরীরে বাঘের মতো একটা উত্তেজনা ওত পেতে আছে। যীশু বিশ্বাস।

তাকে দেখে লোকটা একটু অবাক হয়ে বলল, আপনার আসবার কোনো দরকার ছিল না। খুনীকে আমরা নিজের গরজেই ধরব।

কমল বলল, জানি। কিন্তু পুলিশের নামে অনেক বদনামও শুনতে পাই। আপনারা হয়তো আমাদের গরজ নেই দেখে নিজেরাও আর তেমন গরজ করবেন না। আপনাদের তো শুধু একটা কেসই নয়।

যীশু মাথা নেড়ে একটু বিরক্ত গলায় বলল, আমাদের গরজ নেই কে বলল? খুব বেশি মাত্রায় আছে। তবে আপনার হাজব্যাণ্ডের কানেকশনগুলো বুঝতে

দেরি হচ্ছিল। উনি একসময়ে একটু নকশাল মুভমেন্ট করতেন। কিন্তু সেটা থেকে কিছু বের করা গেল না। মোটিভ না পেলে খুনীকে ট্রেস করা কঠিন। একটু সময় লাগবে। আপনি বাড়ি যান, আমরা আমাদের কাজ করব।

লোকটার দিকে চেয়ে কমলের মনে হয়েছিল, এ পারবে, এ ঠিক পারবে। এমন কিছু মানুষ আছে যাদের দেখলেই আশা ভরসা হয় এবং আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়, নির্ভর করতে ইচ্ছে করে। যীশু এই অদ্ভুত নামের অধিকারী লোকটা ঠিক ওরকম।

কমল কাঁদছিল, সামান্যই।

যীশু বলল, কাঁদছেন কেন? বলেছি তো সব ঠিক হয়ে যাবে।

কী ঠিক হয়ে যাবে? আমার জীবন আবার আগের মতো হবে?

যীশু মাথা নাড়ল, তা বলিনি, যা ঘটে গেছে তা তো আর ওল্টানো যাবে না। তবে প্রতিকার নিশ্চয়ই করা যাবে।

কমল মাথা নেড়ে বলল, প্রতিকারই বা আর কী হবে?

যীশু একটু ভাবল, তারপর বলল, দেখুন মিস ঘোষ, আপনার জীবনটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে ভাবলে ভুল করবেন। যে-মানুষটা গেছে তাকে তো আপনি ভাল করে চিনতেনও না। তার কথা মনে করে বসে থাকবেন কেন?

মিস ঘোষ শুনে পা থেকে মাথা অবধি চমকে গেল কমল। ঘোষ? এ লোকটা তাকে ঘোষ কেন বলছে?

আমি মিসেস ঘোষ নই যীশুবাবু। মিসেস সাধু।

এবার অবাক হওয়ার পালা যীশুর। সে কমলের দিকে অকপটে চেয়ে থেকে বলল, সাধু! আপনার তো সাত পাকও হয়নি।

সাত পাক হয়েছিল। শুভদৃষ্টিও।

যীশু থতমত খেয়ে বলল, সে কী? জবানবন্দি নেওয়ার সময় আপনারা সবাই তো উল্টো কথাই বলেছিলেন। সকলে ক্যাটেগরিক্যালি বলেছে যে, সাত পাক হয়নি। কন্যাপক্ষ বরপক্ষ সবাই।

জানি যীশুবাবু, সেটাই বলার কথা।

যীশু এবার কমলকে ভাল করে লক্ষ করল। বিধবার পোশাক সে এতক্ষণ তেমন খেয়াল করেনি। বলল, আপনার বিধবা হওয়ারও তো কোনো কারণ দেখছি না।

যীশুবাবু, আমাকে একটা দয়া করুন। আপনার রিপোর্টে একথাটা দিয়ে দিন যে, আমাদের সাতপাক আর শুভদৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল।

যীশু খুবই অবাক হয়ে বলল, কেন মিস ঘোষ? আপনি কেন তা চাইছেন?

আমার দরকার যীশুবাবু।

যীশু মাথা নেড়ে বলল, তা তো হয় না মিস ঘোষ। সাত পাক যে হয়নি তার সাক্ষী অনেক। আমি যা-খুশি তাই রিপোর্ট দিতে পারি না।

সাক্ষীদের আমি ম্যানেজ করব।

তা হয়তো আপনি পারেন, কিন্তু পুলিশ ম্যানেজ হবে না।

প্লীজ! আমাকে এইটুকু দয়া করুন। আমি আপনাকে খুশি করে দেবো।

এ কথায় যীশু ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল। ধীর স্বরে বলল, পুলিশ সবচেয়ে বেশি ঘুস কার কাছ থেকে পায় জানেন? খুনীর কাছ থেকে। খুনের মামলার আসামী বা তার আত্মীয়রা ঘটি বাটি গয়না বিক্রি করে দিয়েও পুলিশকে খুশি করতে চায়। সব পুলিশই যদি ঘুস খেতো মিস ঘোষ, তাহলে দেশের একটা খুনীও ধরা পড়ত না।

কমল ফের কাঁদল। অনেকক্ষণ। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। কিন্তু এ কান্নাটা তার আসল কান্না ছিল না। ছিল অভিনয়। তাই এমনভাবে কাঁদল যাতে তাকে অসুন্দর বা কুৎসিত না লাগে। কমলের চোখ সুন্দর। সেই চোখ দুখানা সে যীশুর ওপর যথাসাধ্য প্রয়োগ করে গেল। এতটা করেছিল কমল।

যীশু অবশ্য তাতে কোমল হল। কিন্তু মত পাল্টাল না। বলল, নিজের ক্ষতি করবেন না মিস ঘোষ। আইনের চোখে, সমাজের চোখে আপনি এখনো সম্পূর্ণ কুমারী। আবার বিয়ে করতে কোনো বাধা নেই।

আমি বিয়ে করতে পারব না যীশুবাবু। আমার বিয়ে হয়ে গেছে। আমি ওর রক্ত দিয়েই সিঁদুর পরে নিয়েছি।

ওটা সেন্টিমেন্টাল কথা হল।

আপনি সেন্টিমেন্টের দাম কেন বুঝছেন না বলুন তো? একটা রিপোর্টে সামান্য কথাটা লিখে দিতে দোষ কী?

আমার চাতুরি ধরা পড়ে যাবে। রিপোর্ট নাকচ হয়ে যাবে কোর্টে।

আমি ওদের একটু শিক্ষা দিতে চাই। ওরা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, বউ বলে অ্যাকসেপ্ট করেনি।

যীশু আবার একটু ভাবল, তারপর বলল, অজয় সাধুর বেশ অনেক টাকা ছিল। চাকরিটা ভালই করত, নিজের প্রেসও ছিল। তাই না?

হ্যাঁ যীশুবাবু।

আপনি কি ওর ওয়ারিশন হতে চান?

চাই।

যীশু সামান্য নাক সিঁটকে চেয়ে দেখল কমলকে। তারপর বলল, শুধুমাত্র

কিছু টাকার জন্য এতটা করবেন ?

কথাটা হুলের মতো বিঁধে গেল কমলের বুকে। টাকার জন্য এতটা করবেন ? সে মুখ রাখতে বলল, শুধু টাকা নয়। আমি আমার শ্বশুরবাড়ির লোককে একটু শিক্ষাও দিতে চাই।

যীশু মাথা নেড়ে বলল, পারবেন না। আপনার দাবি ধোপে টিকবে বলে মনে হয় না। আমি আইন তেমন জানি না, তবে ওয়ারিশান অ্যাক্ট অত সহজ নয়।

কিন্তু কমল এত সহজে হার মানেনি, দাদা অর্ধেন্দুকে নিয়ে গিয়ে দেখা করেছে উকিলের সঙ্গে।

উকিল কেসটা অর্ধেন্দুর কাছ থেকে আগেই শুনেছেন এবং সমস্যাটা নিয়ে ভেবেছেন। কমলকে বললেন, সাত পাক না হয়ে থাকলে বিয়ে প্রমাণ করা মুশকিল। তবে একটা কাজ করতে পারি, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড যাতে কাউকে দেওয়া না হয় তার জন্য একটা কোর্ট অর্ডার বের করে দেবো। আর প্রেসটাও সিল করা যাবে। তবে এসবই টেম্পোরারি। সাকসেসর ঠিক হয়ে গেলে আটকানো যাবে না। যতদূর সম্ভব ডিলে করা যাবে।

কমল ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিল, সে হেরে যাচ্ছে। সে তো অজয়ের বিষয়সম্পত্তি চায় না। সে মৃত অজয়ের স্ত্রী হিসেবে একটা স্বীকৃতি চায়। কিন্তু কোথাও সেই স্বীকৃতি পাওয়া গেল না। ভাবাবেগ-বশে রক্ত দিয়ে সিঁদুর পরা তার বৃথাই গেল। ওসব ভাবাবেগের কোনো দাম নেই। তাছাড়া ওই যীশু বিশ্বাসের ওই কথাটা যত বার মনে পড়ে ততবার সে চমকে চমকে ওঠে। শুধুমাত্র কিছু টাকার জন্য এতটা করবেন।

যে লোকটা তার সমস্ত স্বপ্নকে চুরমার করে দিয়ে গেল সেই বন্দুকধারীকে পেলে কমল নিজের হাতে খুন করে। কিন্তু খুনের দুমাসের মধ্যেও সে ধরা পড়ল না।

কমল আবার থানায় গেল। এবং যীশু বিশ্বাস নামক কঠিন ও গম্ভীর চেহারার লোকটির সামনে বসল।

যীশু যখন তার দিকে তাকাল তখন কমলের হঠাৎ কেন যেন মনে হল, এ লোকটির ভিতরে এক ধূ-ধূ মরুভূমি। কোথাও ছায়া নেই, জল নেই, সবুজ নেই। এত শুকনো খটখটে মানুষ সে দেখেনি কখনো।

যীশু কিন্তু তাকে দেখে হাসল, বিধবার বেশ ছেড়েছেন তাহলে। বাঃ।

কমল একটু লজ্জা পেল। সে হয় তো বিধবার বেশ জেদবশে আঁকড়ে থাকত। কিন্তু যীশুর সেই হুল মেশানো কথাটা তাকে যেন আমূল পাল্টে দিয়েছে। কিছুতেই সে ভুলতে পারছে না, "শুধুমাত্র কিছু টাকার জন্য এতটা

করবেন ?" লোকে তো তার সেন্টিমেন্টকে বুঝতে চাইছে না, ভাবছে সে এসব করছে টাকার জন্যই। যীশুর সামনে কিছুক্ষণ নতমুখে বসে থেকে সে বানিয়ে বলল, বৈধব্যটা তো শুধু পোশাকেই নয়।

যীশু ফের গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর বলল, আপনি বোধহয় খুনীর খবর জানতে এসেছেন ?

হ্যাঁ। আপনি এখনো তাকে ধরতে পারেননি।

যীশু মাথা নেড়ে বলল, না। তবে ধরব। সে পালাতে পারবে না।

কমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, পালাতে না পারলেই বা কী ? খুনের আসামীদের আজকাল শাস্তি কমই হয়।

আমাদের কাজ খুনীকে ধরা এবং কেস সাজিয়ে দেওয়া মিস ঘোষ। শাস্তি তো আর আমরা দিতে পারি না।

কমল শঙ্কিত গলায় বলল, যত দেরি হবে তত যে আমি লোকটার মুখ ভুলে যাবো। কয়েক সেকেন্ডের দেখা ওই মুখ কি বেশিদিন মনে রাখা যায় ?

সেটা ঠিক। তবে রোজ লোকটাকে মনে করবার একটা চেষ্টা করবেন। আর যদি ধরতে পারি তাহলে আইডেন্টিফিকেশন প্যারেডের আগেই আমি লোকটাকে চিনিয়ে দেবো। অন্য সাক্ষীও আছে। ভয় নেই, তাকে ঠিকই চেনা যাবে।

কমল চলে এল। জীবন ক্রমশ নিস্তরঙ্গ হয়ে আসছে। ঘটনাটা ধীরে ধীরে ভুলে যাচ্ছে লোকে। সন্তোষপুরে তাদের সাদামাটা বাড়িতে এক সাদামাটা জীবন কাটাতে হচ্ছে তাকে। খবরের কাগজ দেখে দেখে সে বিভিন্ন জায়গায় চাকরির দরখাস্ত পাঠায়। পাঠানোই সার হয়। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে কোনো খবরই আসে না। কী করে লম্বা আয়ুটা কাটানো যায় তা ভেবে পাগলের মতো লাগে তার মাথাটা।

অর্ধেন্দু একদিন বলল, চল, অজয়ের অফিসে যাই।

গিয়ে ?

কেউ মারা গেলে তার নিয়ারেস্ট ওয়ানকে চাকরি দেওয়ার নিয়ম আছে।

কিন্তু আমি ওর কে ? নিয়ারেস্ট কেউ তো নই।

চল না।

কমল মাথা নেড়ে বলল, না দাদা, আমার বিধবা-বিধবা ভাবটা কেটে গেছে। আমি নিজেকে কুমারী ভাববার চেষ্টা করছি।

অর্ধেন্দু নির্বিকার গলায় বলল, তুই তো কুমারীই।

তাহলে তখন অন্যরকম বলেছিলি কেন ?

অজয়ের টাকা পয়সাগুলো যখন পাওয়াই গেল না তখন আর বিধবা সেজে

থেকে কী হবে ? টাকাটাও বড় কম ছিল না। প্রেসটার ভ্যালুয়েশনই নাকি লাখ টাকার ওপর। তাছাড়া প্রভিডেন্ট ফাণ্ড গ্র্যাচুইটি মিলে অনেক টাকা। তার ওপর অজয়ের চাকরিটা পেয়ে যেতিস।

কমল তার দাদাকে চেনে, এই পরিবারকেও চেনে, তাই অবাক হল না। কিন্তু একটু ঘেন্না হল। সে বিধবা সেজেছিল ভাবাবেগবশে, আর এরা তাকে বিধবা সাজিয়েছিল লোভের বশে। পঁচিশ বছর বয়সী অর্ধেন্দু সম্পূর্ণ বেকার, বাবা ইন্দ্রনাথ একটা কলেজের কেরানী, রিটায়ার করার লগ্ন দ্রুত এসে যাচ্ছে। পরিবারটার মাথায় ওপর ঝুলছে অনিশ্চয়তার খাঁড়া। কাজেই এদের এরকম মানসিকতা খুব অস্বাভাবিক নয়।

কমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অর্ধেন্দুকে বলল, অজয়ের ব্যাপারটা তোরা ভুলে যা দাদা। আমাকেও ওসব বলিস না।

অর্ধেন্দু উদাসভাবে বোনের মুখোমুখি বসে রইল। তারপর বলল, তোর কেস তবু ভাল। আমার গিরিধারী নামে এক বয়স্ক বন্ধু ছিল। এল আই সিতে চাকরি করত। যখন বেকার ছিল তখন একটা মেয়ের সঙ্গে ভাব-ভালবাসা হয়। রেজিস্ট্রিও হয়েছিল। তারপর মেয়ের বাবা-মা জানতে পেরে তুলকালাম কাণ্ড। সাত দিনের মধ্যে মেয়ের অন্য পাত্র ঠিক করে ফেলল টাকার জোরে। মেয়ে আর মেয়ের মা এসে গিরিধারীকে ধরে পড়ল, যেন সে বাধা না দেয়। গিরিধারী লোকটা ভালই ছিল। যখন বুঝল, মেয়েটাও ঠিক তাকে চায় না, ভুল করে রেজিস্ট্রি করে বসেছে বটে, কিন্তু এখন বাপ বিগড়োনোতে ঘাবড়েও গেছে, তখন গিরিধারী আর কী করবে ? রাজি হয়ে কথা দিয়ে দিল যে, সে কিছু করবে না। মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেছে বছর চার পাঁচ হবে। একটা বাচ্চাও হয়েছে। গিরিধারী হঠাৎ গত বছর একটা অ্যাকসিডেন্টে মারা গেল। তুই ভাবতে পারবি না সেই মেয়েটা কী করেছিল।

কী করেছিল ?

ম্যারেজ সার্টিফিকেট জোগাড় করে বিধবা সেজে গিয়ে গিরিধারীর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা পয়সা সব উশুল করেছে।

যাঃ। মেয়েরা তা পারে নাকি ? আর স্বামীই বা একাজ করতে দেবে কেন ?

পারল তো, আর স্বামী যখন ফালতু টাকার গন্ধ পেল তখনই ভিজে গেল। অফিসেরও অনেকেই জানে। গিরিধারীর বুড়ি মা ছাড়া আর কেউ নেই, শোকাতাপা সেই বুড়ির সাধ্য ছিল না মেয়েটাকে আটকায়। শুধু তাই নয়, মেয়েটা গিরিধারীর চাকরিটাও পেয়ে গেছে। প্রথম কিছুদিন বিধবা সেজে অফিসে যেত, এখন ভোল পাল্টে নিয়েছে। আমরা কিন্তু অতটা নিচে নামিনি

কমল। টাকার জন্য লোকে কত কী করে।

কমল অনেকক্ষণ চোখ বুজে বিছানায় পড়ে রইল। বিছানাই আজকাল তার প্রায় সব সময়ের আশ্রয়।

মা অবশ্য বকে, কেন সারাদিন শুয়ে শুয়ে ওসব চিন্তা করিস ? বরঞ্চ সিনেমা বায়োস্কোপ দেখে আয়, বেলুড়ে গিয়ে খানিকক্ষণ বসে থাক, মনটা ভাল হবে।

কমলের একটা বোন আছে। লবঙ্গ। দেখতে দারুণ সুন্দরী। কমলও সুন্দর বটে, কিন্তু লবঙ্গর মতো আলো করা রূপ নয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় লবঙ্গ বোবা আর কালা। মাত্র উনিশ বছর বয়সী মেয়েটা তার বাপের আর এক গলগ্রহ হয়ে থাকতে পারত। কিন্তু কপালটা একদিক দিয়ে ভালই। পাড়ায় একটা বাড়িতে লবঙ্গ খুব যেত। সুধীর দাস বেশ বড়লোক। তার মা নাতির জন্য লবঙ্গকে পছন্দ করে রেখেছেন। সুধীর দাসেরও ওই একটিই ছেলে। তেমন ব্রিলিয়ান্ট কিছু নয়, তবে বি এ পাশ। তার চেয়েও বড় কথা বাপের দেদার পয়সা। কমলের বিয়ে হলেই লবঙ্গর বিয়ের শানাই বাজবে, কথাই ছিল।

কমলের বিয়ের রাতে বীভৎস ঘটনাটা ঘটবার পরই সুধীর দাসের বউ আর মা লবঙ্গকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে রেখেছেন। তারপর থেকে লবঙ্গ একরকম সেখানেই আছে। এতে এবাড়ির কেউ কিছু মনেও করেনি। লবঙ্গকে এমনিতেও সারাদিন ওবাড়িতেই থাকতে দেখা যায়, রাতের বেলা আগে শুতে আসত। আজকাল রাতেও ওরা ছাড়ে না। সুধীর দাসের মায়ের কাছেই শুয়ে থাকে। লবঙ্গ যে এ বাড়ির মেয়ে সেটা সবাই ভুলতে বসেছে।

অনেকদিন বাদে একদিন লবঙ্গ এল, সঙ্গে সুধীর দাসের মা। লবঙ্গর সারা গা গয়নায় ঝলমল করছে। আর কী সুন্দরই না দেখতে হয়েছে।

কমল গিয়ে বোনের হাত ধরল, ওমা। তোকে যে চেনাই যাচ্ছে না।

লবঙ্গর যখন দশ বারো বছর বয়স, যখন সবে বয়ঃসন্ধির খোলস ছাড়ছে তখন থেকেই সুধীর দাসের মা লবঙ্গর দখল নিয়ে নিল। সবাইকে বলে বেড়াতে লাগল এ মেয়ে আমার নাতবউ হবে। কেউ নজর দিও না গো।

সুধীর দাসের মতো বড়লোকের এই ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার কারণ বা সাহস কোনোটাই তাদের হয়নি। বরং এটাকে ভগবানের আশীর্বাদ বলেই মনে হয়েছে বরাবর। যামিনী ঠাকুমা—অর্থাৎ সুধীর দাসের মা—তখন থেকেই সুকৌশলে মেয়েটাকে এবাড়ির বাঁধন থেকে একটু একটু করে ছাড়িয়ে নিয়েছেন। নিজেই এসে সকালবেলায় নিয়ে যেতেন। সারাদিন কাছে রাখতেন। রাত্রিবেলা পৌঁছে দিয়ে যেতেন। দিনের পর দিন। তখন থেকেই গয়না পায় লবঙ্গ। পালে পার্বণে দারুণ দারুণ সব শাড়ি।

লবঙ্গর মা কয়েকবারই সসঙ্কোচে বলেছেন, আমার বোবা কালা মেয়েকে নিচ্ছেন, কত অসুবিধে হবে। আপনাদের মতো মানুষ হয় না।

যামিনী ঠাকুমা সঙ্গে সঙ্গে ঝংকার দিতেন, আমার বোবা কালাই ভাল। এ মেয়ে তো অন্তত বরের কানে বিষ ঢালবে না, আর ঘরও ভাঙবে না। আমি সেইরকম করেই তৈরি করে নিচ্ছি ওকে। তোমরা কিছু মনে কোরো না।

কেউ কিছু মনে করেনি। তবে লবঙ্গকে তারা ভুলতে বসেছিল। কে জানে লবঙ্গও তাদের ভুলেছে কতটা।

হাতটা ধরেই বুঝতে পেরেছিল কমল, লবঙ্গ যেন কেমন কাঠ-কাঠ। চোখের চাউনিটাও ভাল নয়। যেন তাকে গিলছে।

লবঙ্গ একা আসেনি, সঙ্গে যামিনী ঠাকুমা। তাঁর মুখটা থমথমে।

মা রান্নাঘরে ছিলেন। যামিনী ঠাকুমাকে দেখে তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি জলচৌকিটা এগিয়ে দিলেন, বসুন মাসীমা।

বসার কথা পরে হবে। শোনো, একটা ব্যাপার ঘটেছে।

কী ব্যাপার মাসীমা ?

লবঙ্গর তিনটে গয়না পাওয়া যাচ্ছে না। গলায় একটা চার ভরির হার, একটা মুক্তোর আংটি আর এক জোড়া সলিড সোনার চুড়ি। হদিশ বলতে পারো ? অন্তত সাত ভরি সোনার জিনিস।

এ কথায় মায়ের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না।

যামিনী-ঠাকুমা প্রতাপান্বিত মহিলা, বড় একটা কারো তোয়াক্কা করেন না। একটু কড়া গলায় বললেন, শুনলাম গয়নাগুলো তোমরা বিয়ের রাতে কমলের গয়না বলে আসরে সাজিয়ে দিয়েছিলে। হারটাও ওর গলায় ছিল, সোনার চুড়ি, আংটি সবই। এ সব কী ব্যাপার বউমা ? লবঙ্গর জিনিস কমলকে দিলে কেন ? আর দিতে হলে অন্যের জিনিস একবার বলতেও তো হয়।

মা চোখের জল মুছলেন নীরবে। তারপর ধরা গলায় বললেন, আমাদের অবস্থা তো জানেনই মাসীমা। কমলকে সাজাবো তেমন গয়না আমাদের কই ? তাই উপায় ছিল না বলেই সাজিয়েছিলাম। বিয়ে ভালয় ভালয় হয়ে গেলেই লবঙ্গর গয়না লবঙ্গকে ফেরত দিতাম।

বিয়ে তো চুকে-বুকে গেছে, এখন গয়নাগুলো কোথায় ? আর সেগুলো দাওনি কেন ?

দিতাম মাসীমা। কী কাণ্ড হয়ে গেল, আমাদের কি মাথার ঠিক আছে ?

তোমাদের অবস্থা চিন্তা করেই কথাগুলো এতদিন তুলিনি। এবার তুললাম কেন জানো ? গয়নাগুলো লবঙ্গকে আমারা আশীর্বাদী হিসেবে নানা সময়ে

দিয়েছি.। ও গয়না আর কেউ পরলে সেটা ভাল হয় না। বিশেষ করে বিয়ের কনে। তার ওপর ও বোবা কালা, ওরটা কেড়ে নেওয়াও সহজ।

কেড়ে তো নিইনি মাসীমা?

ও তো তাই বলছে।

মা বিব্রত হয়ে বললেন, ঠিক কেড়ে নেওয়া নয়। একটু যেন আপত্তি করছিল।

লবঙ্গ কথা বলতে না পারলেও ভাবভঙ্গিতে সব বুঝিয়ে দেয় বউমা। ওকে বোকা ভেবো না। বিয়ের রাতেই বলেছে। কিন্তু তোমাদের যা হল, আমি আর তাই কথাটা তুলিনি।

গয়না ফেরত দিয়ে দিচ্ছি মাসীমা। রাগ করবেন না।

যামিনী ঠাকুমা মাথা নেড়ে বললেন, গয়নায় রক্ত লেগেছিল বউমা, আমরা জানি। ও গয়না আমার স্যাকরার হাতে দিয়ে দিও। তাকে পাঠিয়ে দেবো। ভেঙে আবার গড়াবে। তাতেও কিছু অমঙ্গল থেকে যাবে কিনা কে জানে। কাজটা তোমরা মোটেই ভাল করোনি। সুধীরও শুনে খুব রাগ করেছিল।

এই বলে যামিনী ঠাকুমা ভাবী নাত বউ লবঙ্গর হাতটা ধরে নিয়ে চলে গেলেন। আর বাড়িতে নেমে এল এক নিস্তব্ধতা।

অনেকক্ষণ বাদে নিস্তব্ধতা ভাঙল কমল।

মা।

মা কাঁদছিলেন। হাপুস হয়ে। ভাতের ফ্যান উপচে উনুনে পড়ে গন্ধ ছড়াচ্ছিল। জবাব দিলেন না।

কমলের হাতে আংটিটা আর গলায় হারটা রয়েই গেছে। কমল খোলেনি, মনেই ছিল না। দুটোই খুলে মার সামনে রান্নাঘরের মেঝেয় রেখে দিয়ে বলল, এ বিয়ে ভেঙে দাও মা।

মা চোখ তুললেন, ভাঙব কেন?

ওদের এত কর্তৃত্ব কিসের?

টাকা থাকলেই কর্তৃত্ব আসে। এসব কথা তোর বাবার কানে যেন না যায়।

লবঙ্গ কি আমাদের কেউ নয় মা?

লবঙ্গ তো তা মনে করে না।

আমরা কি চোর? বোনের গয়না বোন পরলে কি চোর হয়?

মাসীমা তো তাই বলে গেলেন। নিজের কানেই তো শুনলি।

রাগে রি রি করে কাঁপছিল কমল। ঘেন্নায় অপমানে সেদিন আবার তার মরতে ইচ্ছে হয়েছিল।

তবে একথা ঠিক যে, কমলও জানত, বিয়ের রাতে যেসব গয়না তাকে পরানো হয়েছিল সেগুলো সব তার নয়। কিছু বোবা কালা লবঙ্গর। আর লবঙ্গও সেই গয়না দিতে চায়নি। জোর করে নেওয়া হয়েছিল তার কাছ থেকে। আর লবঙ্গ ভাষাহীন নানা শব্দে প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

প্রতিবন্ধী এই বোনটিকে এতকাল যেন ভাল করে লক্ষই করেনি কমল। আর আজ বড় বেশি করে করল। আজ তার চোখে পড়ল, লবঙ্গ বড় বেশি ভাগ্যবতী, ঈশ্বর ওকে বড় বেশি দিয়েছেন। হিংসেয় কমলের বুক জ্বলতে লাগল। শুকিয়ে গেল চোখের জল। বোবা আর কালা হওয়া যত দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, অথচ লবঙ্গর বেলায় তাই হয়ে দাঁড়াল ওর গুণ। বিয়ের আগেই শ্বশুরবাড়ির এত আদর ক'জন মেয়ের ভাগ্যে জোটে?

হিংসের বাঘটা সারাদিন ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেল কমলকে। বাঘের থাবা, তার নখের আঁচড়, দাঁতের ধার মর্মে মর্মে গভীর গভীরতর বসে যাচ্ছিল। সারাদিন বিছানায় সে আর বাঘ। বাঘ আর সে। উত্তপ্ত শরীর, মাথার মধ্যে পাগলাটে ঝড়, চোখে জ্বালা।

লবঙ্গকেও হিংসে করতে হবে এ কখনো ভাবেনি কমল।

রাত্রিবেলা যখন তারা রান্নাঘরে খেতে বসেছে তখন কথাটা উঠল।

ইন্দ্রনাথ স্তিমিত গলায় বললেন, কাজটা আমাদের ঠিক হয়নি লবঙ্গর গয়না কমলকে পরানোটা ভুলই হয়েছে। ওঁরা অপমান করতেই পারেন।

সকলেই এব্যাপারে একমত দেখে কমলকেই বলতে হল, গয়না নেওয়া না হয় ভুলই হয়েছে, কিন্তু যামিনী ঠাকুমা কোন সাহসে বাড়ি বয়ে এসে আমাদের অপমান করে যায় বাবা? সে কি আমরা গরিব বলে?

ইন্দ্রনাথ ততোধিক স্তিমিত গলায় বললেন, কী আর করা যাবে?

অন্য কেউ হলে এ বিয়ে ভেঙে দিত। আমাদের আত্মসম্মান বোধ একটুও নেই বাবা।

ইন্দ্রনাথ অবাক হয়ে বললেন, এই সামান্য কারণে বিয়ে ভাঙার প্রশ্ন ওঠে কেন? মেয়ের বিয়ে কি চাট্টিখানি কথা!

মা একটু ফোঁস করলেন, অপমান যদি করেই থাকে তো আমাকেই করেছে। তুই গায়ে মাখছিস কেন? লবঙ্গর গয়না তো আমিই নিয়েছিলাম।

নিলে কেন?

তোকে ন্যাড়া দেখাচ্ছিল, তাই নিয়েছি। লবঙ্গ যে নালিশ করবে তা তো জানা ছিল না।

যাদের ক্ষমতা নেই তারা ন্যাড়া মেয়েকেই আসরে বসাবে, গয়না ধার করবে

কেন ?

পুরোনো কথা তুলে আর কী হবে ? তোর যখন আবার বিয়ে দেবো তখন আর ভুল হবে না।

বিয়ে ? বলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল কমল। এদের লজ্জাও কি নেই ?

অর্ধেন্দু হঠাৎ বলল, বিয়ে করবিই বা না কেন ? একটা ঘটনা ঘটে গেছে বলেই তো আর জীবনটা শেষ হয়ে যায়নি ? আর সম্বন্ধও যখন একটা এসেছে, চেষ্টা করতে দোষ কী ?

সম্বন্ধ ! কে সম্বন্ধ আনল ?

মা, বাবা, অর্ধেন্দু তিনজনেই একটু চুপ মেরে গেল, পরস্পর একটু মুখ তাকাতাকিও করল কি ?

তারপর অর্ধেন্দু বলল, সমীরবাবুর ছেলে অশোক। বিয়ের আসরে সেও উপস্থিত ছিল। নিজে থেকেই বলেছে, কমল রাজি থাকলে আমি ওকে বিয়ে করব।

কমল নিবে গেল। অশোককে সে চেনে। দীর্ঘদিন বেকার ছিল, রকবাজি করত। ইদানীং তিন বন্ধুতে মিলে একটা ছোট্ট ওষুধের দোকান দিয়েছে পাড়ার মধ্যেই। দোকান এখনো তেমন চালু হয়নি।

কমল ঠোঁটটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে উল্টে বলল, যেমন তেমনভাবে পার করতে চাস ? তোদের দয়া করে আমার বিয়ে নিয়ে ভাবতে হবে না।

এখন যে তাকে বিয়ে করবে সে দয়াই করবে, জানে কমল। দয়াটা সে চায় না।

দিন চারেক বাদে হঠাৎ একদিন সকালে যীশু বিশ্বাস এসে হাজির। গম্ভীর, কঠিন এক স্তম্ভের মতো চেহারা। মুখে কর্কশ সব রেখা ফুটে থাকে। আগাগোড়া যেন নীরস পাথরে তৈরি এক পুরুষমূর্তি। আনন্দহীন, রসবোধহীন, মায়াদয়াহীন।

কমল অভ্যর্থনা করে বারান্দায় চেয়ারে বসাল, কোনো খবর আছে ?

যীশু মাথা নেড়ে বলল, আছে। অজয়বাবু সম্পর্কে কিছু খবর পাওয়া গেছে।

কী খবর ?

স্মাগলিং।

কমল সীমাহীন বিস্ময়ে বলল, স্মাগলিং ?

যীশু একটু হাসল। ম্লান হাসি। ওর পাথুরে মুখে হাসি জিনিসটা মানায় না। মাথা নেড়ে বলল, আরো আছে। উনি কল গার্লদের এজেন্ট হিসেবেও ইদানীং কাজ করতে শুরু করেছিলেন। অবশ্য হাই ক্লাস কল গার্ল। বড় বড় হোটেলে

ওর লোক পিন আপ ছবির প্যাম্‌ফলেট দিয়ে আসত। ফোন নম্বর দেওয়া থাকত। এমন কি রেট পর্যন্ত। দেখবেন?

যীশু একটা অত্যন্ত সুদৃশ্য সিল্ক স্ক্রিনে ছাপা বুকলেট পকেট থেকে বের করে দিল। দশ জন মেয়ের ছবি এবং ভাইট্যাল স্ট্যাটিস্টিকস দেওয়া রয়েছে ভিতরে।

যীশু মৃদুস্বরে বলল, এটা ওঁর প্রেসেই ছাপা। ফোন নম্বরটিও ওঁর।

কমল কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

যীশু উঠল। বলল, আমরা জনা সাতেককে ধরেছি। এরা কেউ প্রাইম সাসপেক্ট নয়, তবে লীড দিতে পারবে। স্মাগলিং আর কল গার্ল কানেকশনেই খুনটা হয়েছে, সন্দেহ নেই। দিন দুয়েকের মধ্যেই খুনী ধরা পড়বে।

কমল কথা বলতে পারছিল না। মৃত অজয় আর একবার তাকে চুরমার করে দিয়েছে ভিতরে বাহিরে।

যীশু তার মুখের ভাব লক্ষ করে বলল, সরি মিস ঘোষ। যা সত্য তাকে এড়ানো যায় না।

যীশুর চোখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে ছিল কমল। হঠাৎ তার মনে হল, চোখের মধ্যে কী যেন ধক ধক করে জ্বলছে। একটু শিহরিত হল সে।

॥ ৩ ॥

ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল এক তরুণী বিধবার দুটি চোখ থেকে। মাঝে মাঝে এই সব দুর্ঘটনা ঘটে যায় পৃথিবীতে, মানুষের কিছু করার থাকে না।

এখনও ডিটেলটা এত খুঁটিনাটিসহ হুবহু মনে পড়ে যে, যীশু ভারী অস্বস্তিতে পড়ে যায়।

বিয়ের রাত ছিল কমলের। কত কষ্টে একটি বাঙালী মেয়ের পাত্র জোগাড় হয় তা যীশুর চেয়ে ভাল আর কে জানে। নিজের দু দুটি বোনকে সে পার করেছে। কমলও তো ওরকমই ছা-পোষা ঘরের মেয়ে। বুড়ো বাপ প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ভেঙে, ধারকর্জ করে টাকার জোগাড় করেছে। বিয়ের রাতে বর-বউকে যখন সাত পাক আর শুভদৃষ্টি করাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখনই খোলা বিয়ের আসরে তিনটে লোক ঢুকল। দুজনের হাতে স্টেনগান, তৃতীয় জনের হাতের ব্যাগে বোমা, বরকে প্রায় বুলেটের মালা পরিয়েছিল দুজন, আর একজন আসর উড়িয়ে দিল দমাদম বোমবাবাজিতে।

ঘটনাটার এত হুবহু জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছিল কমল যে, যীশু স্পষ্ট এবং পরিষ্কার দেখতে পায় আজও। বাড়ির সামনে মস্ত উঠোন। চাঁদোয়ার নিচে

বিয়ের আসর। পুরুত মন্ত্র পাঠ করিয়ে বর-বউকে তুলে দিল, যান গিয়ে, স্ত্রী-আচার করে আসুন। এক দঙ্গল মেয়ে ও মহিলা এসে বর-বউকে ঘিরে ফেলল। সাত পাক হবে, শুভদৃষ্টি হবে। যার হয় সে যেমন শিহরিত হয়, যার হবে এবং যার বহুকাল আগে হয়ে গেছে সেও মৃদুমন্দ শিহরন টের পায়। মেয়েদের কাছে সাত পাকই আসল কথা। আর আঠা-মাখানো চোখ তুলে বরের দিকে প্রথম তাকানো শঙ্খে উলুধ্বনিতে পৃথিবী দুলতে থাকে। সে এক মোহময় মুহূর্ত। কমল তত দূর পৌঁছোতে পারেনি। সামনে কাঁচা রাস্তায় কিছু উটকো লোকজন দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারছিল আসরে। হঠাৎ তাদের ঠেলে সরিয়ে তিনজন ঢুকল। সামনে দুজনের হাতে স্টেন। তৃতীয়জন কাঁধের ঝোলায় হাত পুরে রেখেছে।

প্রথমে ফাটল একটা বোমা! আর তাতেই গোটা আসরটা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল চোখের পলকে। লোকজনের চেঁচামেচি, চেয়ার উল্টে পড়ার শব্দ, বাচ্চার কান্না।

আগন্তুকরা অবশ্য কারো দিকেই দৃকপাত করেনি। সোজা এসে বরের প্রায় বুকে নল ঠেকিয়ে ট্যারা-রা-রা করে চালিয়ে দিল তাদের যত বিষ। এত দ্রুত এবং চোখের পলকে হয়ে গেল ঘটনাটা যে, কমল অনেকক্ষণ বুঝতেই পারল না কী হয়েছে। অথচ তার পায়ের কাছেই তখন পড়ে আছে অজয়, তার ভাবী স্বামী। বুক থেকে পেট অবধি অজস্র ফুটো দিয়ে বলবল করে রক্ত বেরিয়ে ভিজিয়ে দিল কমলের পা।

ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যেই বিয়ের সেই আসরে হাজির হয়েছিল যীশু। নিরাসক্ত চোখে দেখেছিল ছয়ছত্রখান, পণ্ড আসর। এরকম ঘটনা সচরাচর ঘটে না। খুনীরা কেন বিয়ের আসরটাই বেছে নিল?

তারপরই এল কমল।

আরে! আমাদের যীশুভায়া না?

যীশু চোখ মেলল।

ভারী বিগলিত মুখে একজন লোক পাশ ঘেঁষে বসে পড়ে বলে উঠল, কালও দেখেছি, পরশুও দেখেছি। তখন থেকেই ভাবছি যীশুভায়ার কি হঠাৎ গাঁয়ের দিকে মন টলল নাকি? ব্যাপারখানা কী বলো তো!

অমৃতলালকে যীশুর চিনতে তেমন কষ্ট হল না। গাঁয়ের স্কুলে মাস্টারি করে। এর কাছে যীশু কিছুদিন পড়েওছে। একদম শেষ ক্লাসে যীশু যখন পড়ে তখনই অমৃতলাল স্কুলে চাকরি পায়। দু চারটে ক্লাস নিয়েছে তাদের। সেই সুবাদে যীশুর শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই। কিন্তু এখন যীশু তেমন কোনো শ্রদ্ধাবোধ করছে

না। প্রণাম-ট্রনামও করল না।

ফের চোখ বুজে বলল, এমনি। কদিন একটু বিশ্রাম নিচ্ছি।

খুব ভাল কথা। মাঝে মাঝে গাঁয়ের দিকে এলে আমাদেরও ভাল লাগে।

যীশু বুঝল, লোকটা এখন মেলা বকবে। বকবক করেই যাবে। মানুষের ভিতরটায় আজকাল সাবানের ফেনার মতো কেবলই কথার বুজরুকি।

গাড়িটা থেমে আসছিল। সামনে স্টেশন। যীশু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি এখানে নামছি, কাজ আছে।

বটেই তো, দেখা হবেখন।

যীশু নেমে একটা কামরা বাদ দিয়ে পরেরটায় উঠল। কামরা বেশ ফাঁকা ফাঁকা। জানালার ধারেও জায়গা আছে। যীশু বসে ফের চোখ বুজল।

হ্যাঁ কমল। সর্বাঙ্গে তখনো রক্ত জমাট বেঁধে আছে। চোখে দুঃস্বপ্নের আতঙ্ক। ঠোঁট কাঁপছে। কথা সরছে না।

যীশু বাড়ির লোকজনকে বলল, ওকে ওয়াশ করে আনুন। আর একজন ডাক্তারকেও সম্ভব হলে ডাকুন। শকটা খুব সাঙ্ঘাতিক মনে হচ্ছে।

সেই সময় কমল কথা বলল। একটু বসা গলা, সামান্য কাঁপনও রয়েছে। তবু বলল, আমি এই বেশ আছি। বলুন কী বলতে হবে।

প্রাথমিক প্রশ্ন খুব বেশি করেনি যীশু। ঘটনাটা মোদ্দা জেনে নিয়েছিল অন্য সকলের কাছ থেকে। কমলের কাছ থেকে তাই বেশি কিছু জানার ছিল না। কিন্তু কনের সাজে একটি সুন্দর মেয়ের ওরকম রক্তস্নাত চেহারা যীশু জীবনে দেখেনি। দৃশ্যটা তার মনের মধ্যে এমন গেঁথে গেল।

যীশু তখনই স্থির করেছিল, খুনীকে ধরতেই হবে। এই খুনীকে কিছুতেই রেহাই দেওয়া যায় না।

কিন্তু কেসটা একটু জটিল আর অদ্ভুত ছিল। খুনীরা এসেছিল গাড়িতে। স্থানীয় লোকজন কেউ তাদের কখনো দেখেনি।

বিচক্ষণ বড়বাবু কেসটা শুনেই বললেন, বাইরের হাত আছে। লোকাল মস্তানদের কাজ নয়।

যীশু তবু স্থানীয় গুণ্ডা মস্তানদের বাজিয়ে দেখল। তারা স্পষ্ট করে বলল, আমাদের কাজ নয় স্যার।

যীশুকে গভীর জলে নামতে হচ্ছিল।

দ্বিতীয় দিন যখন কমলকে দেখল যীশু, তখন তার বিধবার পোশাক। চোখেমুখে সীমাহীন ক্লান্তির ছাপ। বাসী গোলাপের কি কিছু আলাদা সৌন্দর্য আছে? হয়তো আছে। শোকে তাপে মানুষের চেহারায় হয়তো ভিন্ন একটা মাত্রা

যোগ হয়। কিছু একটা হল যীশুর মধ্যে। মেয়েটা এমন বিহ্বল অসহায়ভাবে চেয়েছিল তার দিকে, যেন সে ঈশ্বর, মেয়েটা দয়া ভিক্ষা করছে। এরকম অসহায় মেয়েদের জন্যই তো পুরুষদের দুখানা সবল বাহু এগিয়ে যায় আড়াল করতে, রক্ষা করতে। শিভালরি বলে না?

যীশু ভরসা দিল। কিন্তু প্রশ্রয় দিল না। কারণ মনে হয়েছিল, মেয়েটা লোভী। বিধবা সেজে অজয় সাধুর সম্পত্তি হাতাবার তাল করছে।

এরপর আরও কয়েকবার দেখা হল। প্রতিবারই কী যেন হচ্ছিল, কী যেন ঘটে যাচ্ছিল যীশুর মধ্যে।

সে কি প্রেম? সে কি কাম?

যীশুর কি দোষ আছে কোনো? প্রতিদিন বকুল সরে যাচ্ছিল দূরে। ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে। যেমন স্টিমার জেটি ছেড়ে মাঝ গাঙে সরে যায় ঠিক সেইভাবে।

তাদের একঘরের বাসা। তেমন কোনো তৈজসপত্র নেই। একটা মোটে চওড়া চৌকি। তার মধ্যেই শাশুড়ি এসে মোতায়েন হয়েছে। যীশু দুদিন মেঝেতে বিছানা পেতে শুল, মা আর মেয়ে চৌকিতে। তারপর থানাতেই রাত্রিবাস করতে লাগল যীশু। বহুদিন বকুলের সঙ্গে তার দেহসম্পর্ক নেই। আদর আহ্লাদ নেই। তাকে দেখলেই বকুল নীলবর্ণ হয়ে যায়।

একদিন সে শাশুড়িকে বলল, ওকে বরং আপনি নিয়েই যান। কিছুদিন থাকুক আপনাদের কাছে।

শাশুড়ি গোমড়া মুখে বললেন, সে তো বুঝলাম বাবা, কিন্তু তোমার এ রোগের চিকিৎসা কী?

রোগ! কার রোগ?

আমার মেয়ে একটু ভীতু ঠিকই, কিন্তু তাকে দোষ দিতে পারি না। তুমি যদি ওকে একটু ভাল চোখে দেখতে।

যীশু সহজে রাগে না। তার ভিতরে একটা ইনবিল্ট থার্মোস্ট্যাট আছে। রাগের পারদ চট করে লাফিয়ে ওঠে না। তাই সে রাগল না। কিংবা সামান্য রাগলেও সেটা চেপে রেখে বলল, বকুল কি বলে যে, ওকে আমি ভাল চোখে দেখি না?

শাশুড়ি ঘন ঘন মাথা নেড়ে বললেন, বকুল কখনো তোমার নিন্দে করে না। ও শুধু বলে, তোমার চোখ দেখলে ওর ভয় করে।

আমার চোখে কী আছে?

ও ছেলেমানুষ, তোমার মতো কড়া ধাতের লোক তো ও জীবনে দেখেনি।

যীশু একটা বড় শ্বাস ফেলে তার বউকে ডাকল। বকুল দেখতে ছোটোখাটো, বালিকা মুখখানা মন্দ নয়। সমস্ত শরীরেই একটা তুলো-তুলো নরম ভাব আছে। চাউনি বড় অস্থির।

বকু, তুমি তোমার মার কাছে কী বলেছো?

বকুল সভয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। কিছু বলল না।

আমার চোখের দিকে চাইলে তুমি ভয় পাও, কিন্তু কেন পাও?

বকুল এমন স্থির ও কাঠ হয়ে গেল যে যীশুর ভয় হল হার্টফেল করবে। ওর মা গিয়ে তাড়াতাড়ি ওকে জাপটে ধরল। বকুলের তখন হাত-পা ঠাণ্ডা, শরীরে সাড় নেই।

শাশুড়ি চেঁচাচ্ছিলেন, ও মা! কী হবে গো! মেয়ের এ কী হল?

যীশু অপ্রস্তুতের একশেষ। চোখ। চোখের মধ্যে তার কী বিষ আছে?

শাশুড়িকে সে কঠিন গলায় আদেশ দিল, আপনি ঘরের বাইরে যান, আমি ওকে দেখছি।

শাশুড়ি মেয়েকে আড়াল করে বললেন, না। ওকে কিছু বোলো না বাবা। আমারই ভুল হয়েছে কথাটা তুলে।

যীশু শাশুড়ির চোখের দিকে চেয়ে বলল, আপনি পাঁচ মিনিটের জন্য বাইরে যান। কথা দিচ্ছি, এর মধ্যে আপনার মেয়েকে আমি খুন করবো না।

শাশুড়ি ভয় পেলেন বটে, কিন্তু কথাটা মানলেন। বাইরে গিয়ে দরজাটা টেনেও দিলেন কী ভেবে।

বকুল মেঝের দিকে চেয়েছিল। তার চোখ থেকে টপ টপ করে জল পড়ছে।

যীশু দুহাতে বকুলকে মাটি থেকে ওপরে তুলল। ভারী হাল্কা বকুল। একদম ওজন নেই। ওপরে তুলে তার মুখের দিকে চেয়ে যীশু বলল, আমি তোমাকে কেন খুন করব বকুল? খুন করে আমার লাভ কী?

বকুল জবাব দিল না।

ভয়ের কোনো ব্যাখ্যা নেই। ভয় কোনো যুক্তিকেই মানে না। ভয় সব কিছুকেই গুলিয়ে দেয়। অস্বচ্ছ করে দেয় দৃষ্টি। হরণ করে নেয় আবেগ বা ভালবাসা।

বকুলকে দু হাতে ওপরে তুলে নিরীক্ষণ করে যীশু বুঝতে পারল, আশা নেই। বকুলের আর সহজে বিশ্বাস ফিরে আসবে না যীশুর ওপর। অথচ যীশু কোনোদিন ওর গায়ে হাত অবধি তোলেনি। ধমকচমকও সে বড় একটা করে না। দাম্পত্য কলহ তাদের মধ্যে হয়নি কখনো।

বকুল, তুমি বাপের বাড়ি যাও। কিছুদিন থেকে এসো।

বকুলকে নামিয়ে দিয়ে কথাটা বলল যীশু।

বকুল মাথা নেড়ে বলল, যাবো না।

কেন ?

তুমি যদি আর একটা বিয়ে করো ?

যীশু সহজে হাসে না। এ কথায় হাসল, বিয়ে করব ? পাগল নাকি ? আর করলেই বা, তুমি তো আমার ঘর করতেই পারছ না।

চেষ্টা করছি।

যীশু মাথা নেড়ে বলল, চেষ্টাও করছ না। যারা খুনজখম করে বেড়ায়, যাদের ভয়ে সবাই কাঁপে তাদেরও তো বউ আছে। কই তারা তো স্বামীকে এত ভয় পায় না!

আমিও পাবো না। আমাকে একটু চেষ্টা করতে দাও।

যীশু কঠিন হয়ে বলল, চেষ্টা করতে হলে মাকে পাহারায় রেখে চেষ্টা করা যায় না। মাকে ফেরৎ পাঠাও, তারপর চেষ্টা করো।

না, সে আমি পারবো না।

যীশু এই শিশুকে কী বলবে ? বলে কোনো লাভ ছিল না। শুধু বলল, পুলিশকে বিয়ে করা তোমার উচিত হয়নি।

বকুল মাথা নেড়ে বলল, আমি তোমাকে ভয় পাই না। কিন্তু তোমার মধ্যে কী যেন একটা আছে যেটা তোমার চোখের ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝে উঁকি মারে।

আমি তো সেটাই জানতে চাই বকুল, আমার চোখের ভিতরে কী আছে ?

বকুল একথার জবাব দিতে পারেনি। যীশুর হতাশা এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন প্রায় অসম্ভব। বকুল যে তার সঙ্গে আর থাকতে পারবে না এটা ক্রমে প্রকট হয়ে পড়ছিল।

যীশু এই ঘটনার পরে এক চোখের ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করল। সোজাসুজি বলল, কন্ট্যাক্ট লেন্স নিলে কি চোখের চরিত্র পাল্টানো সম্ভব ?

ডাক্তার তার চোখ পরীক্ষা করে বলল, আপনার চোখ তো ঈগলের মতো পরিষ্কার, লেন্স নেবেন কেন ?

যদি চোখ ঢাকতে চাই ?

নিতে পারেন। আজকাল রঙিন কন্ট্যাক্ট লেন্স পাওয়া যায়। কিন্তু আমার মনে হয়, যার চোখ ভাল তার কোনোরকম লেন্সই ব্যবহার করা উচিত নয়। রোদ টোদ উঠলে বড় জোর গগলস ব্যবহার করতে পারেন। চোখ ঢাকতে চান কেন ?

এমনিই।

ডাক্তার একটু হেসে বললেন, বিদেশে অনেক ক্রিমিন্যাল আছে যারা চোখের রং পালটানোর জন্য কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করে। তাতে তাদের ধরতে পুলিশের অসুবিধে হয়। কিন্তু আপনি তো অপরাধী নন, তার বরং উলটোটাই। আপনি পুলিশ। আপনি কেন চোখ ঢাকবেন?

যীশু একটা আবছা জবাব দিয়ে চলে এল। চশমার দোকানে গিয়ে কন্ট্যাক্ট লেন্সের দরদাম করে সে বুঝল, খরচও অনেক। তার আয় সামান্যই। তার মতো লোকের এ বিলাসিতা সাজে না।

তার চেয়ে বরং বউকে ভুলে থাকা ভাল। তার দিকে নজর না দিলেই হল।

যীশু অতঃপর কাজ নিয়েই মেতে থাকতে লাগল বেশি। তার স্বভাবের সঙ্গে পুলিশের চাকরিটা খুব সুন্দর মেলে। যোগ্য ও সাহসী অফিসার বলে সে অল্পবয়সে যথেষ্ট উন্নতিও করেছে।

প্রতিদিন নতুন নতুন অপরাধ সংঘটিত হয়, প্রতিদিন ঝঞ্ঝাট ও ঝামেলা নতুন করে পাকায়, চোর-চোট্টা-বদমাশদের সংখ্যা বাড়ে দিনে দিনে। সুতরাং যীশুরও নাওয়া-খাওয়ার সময় থাকে না।

বড়বাবু, অর্থাৎ ও সি বিচক্ষণ মানুষ। তিনি জানেন সবসময়ে পুলিশকে এত কাজ করতে নেই। একদিন বললেন, ওহে যীশু, এত বেশি অ্যাকশনের দরকার কী? বেশি অ্যাবসকন্ড ভাল না। ইংরিজিতে একটা কথা আছে, লেট দি স্লিপিং ডগ লাই। খোঁচাখুঁচি করতে যাওয়া সবসময়ে ভাল নয়।

যীশু সেটা নিজেও বোঝে।

বড়বাবু তার দিকে চেয়ে বললেন, অনেকদিন ছুটিও নাও না। বিয়ের পর বৌমাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতেও যাওনি। আমি বলি কয়েকদিন ঘুরেটুরে এসো। কাছেপিঠেই যাও। পুরী আছে, দীঘা আছে, দার্জিলিং আছে।

যীশুরও তাই মনে হল। অনেকদিন একটা পিঁজরাপোলে আবদ্ধ হয়ে আছে সে। বড্ড রুটিনের মধ্যে, একটু অনিয়ম দরকার।

বাড়ি ফিরেই বকুলকে বলল, যাবে বকুল বেড়াতে? পুরী, কিংবা দীঘা?

বকুল সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমার দিদি-জামাইবাবুকেও বলি?

কেন, তারা কেন?

তারা কেন তা যীশু জানে। তবু খুব অবাক হওয়ার ভান করল।

না, দিদিও বলছিল, কোথাও যাবে।

যীশু মাথা নেড়ে বলল, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

তাহলে মাকে বলি? মার খরচ তোমাকে দিতে হবে না। বাবা দেবে।

মাও নয়। শুধু তুমি আর আমি।

চূড়ান্ত অনিচ্ছে দেখা দিল বকুলের। শেষ অবধি বোধ হয় ওর বাপের বাড়ির লোকই ওকে কিছু বোঝাল। বকুল একদিন সম্মতি দিয়ে দিল।

পুরীতে প্রথম দিনটা তাদের মন্দ কাটেনি। ভোরবেলা পৌঁছে সারাদিন সমুদ্রের ধারে বেড়ানো, স্নান, প্রচুর খাওয়া, বিপত্তি দেখা দিল রাত্রে। বকুলের চোখে সেই ভয়ার্ত চাউনি।

ক্লান্ত যীশু ঘুমোবে, কিন্তু বকুল বাতি নেবাতে দেবে না। তাও মেনে নিল যীশু।

মাঝরাত্রে তাকে ঘুম থেকে ঠেলে তুলল বকুল, তুমি আমাকে পুরীতে আনলে কেন বলো তো!

হঠাৎ এ কথা কেন?

তোমার কোনো খারাপ মতলব নেই তো। হোটেলের রেজিস্টারে তুমি তোমার সত্যি নাম লিখেছো, না ফলস নাম?

বকুল, বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে।

পুরীতে হোটেলের ঘরে কত খুন হয় জানো? মেয়েদের মেরে পুরুষটা পালিয়ে যায়। খবরের কাগজে পড়ি যে!

যীশু উঠে পড়ল। বলল, ঠিক আছে, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। তুমি ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে ঘুমোও।

আমার যে ভীষণ ভূতের ভয়!

অগত্যা একরকম জেগেই কাটল, রাতটা। বকুল জেগে রইল ভয়ে, যীশু রাগে।

পরদিন সকালে আবার একটু স্বাভাবিক হল বকুল। কিন্তু সেদিন তারা স্বর্গদ্বার ছাড়িয়ে অনেক দূর বেড়াতে গেল। সেখানে নির্জন বালিয়াড়ি আর গড়ানে ঢেউয়ের অবিরাম খেলা।

আর সেখানেই হঠাৎ মুগ্ধ নয়নে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বকুল যীশুর দিকে ফিরল। তারপরই একটা আর্ত চিৎকার, মা গো!

কী হল?

বকুল বালিয়াড়ি ভেঙে আচমকাই একটা প্রাণপণ দৌড় লাগাল। চিৎকার করে বলল, বুঝেছি! বুঝেছি! কেন তুমি আমাকে এতদূর এনেছো! মেরে ফেলবে....মেরে ফেলবে....

সেদিন বাস্তবিকই বকুলকে খুন করতে ইচ্ছে হয়েছিল যীশুর। বকুলের চিৎকার শুনে দু চারজন লোক কোথা থেকে এসে জুটল। তারাও রীতিমত

চেঁচামেচি করতে লাগল। বে-ইজ্জতির একশেষ।

হোটেলের ঘরে ফিরে এসে যীশু আর কথা বলল না। জিনিসপত্র গোছাতে লাগল।

বকুল একটু ক্ষমা চাওয়ার চেষ্টা করেছিল। যীশু ঝেড়ে ফেলল বকুলকে। শুধু বলল, গুছিয়ে নাও। আজই রাতের ট্রেন ধরব।

ফিরে এসে সোজা বকুলকে তার বাপের বাড়ি গিয়ে তুলে দিয়ে এল যীশু। তারপর আর বকুলের কথা ভাবল না।

কিন্তু ভুলতেও পারল না। বিয়ের পাঁচ বছরের মাথায় গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে শিখা রায় নামে একটা মেয়ে মারা গেল। মৃত্যুকালীন জবানবন্দি নিতে গেল যীশু। মেয়েটা বলল, আমি আমার স্বামী আর শ্বশুরবাড়ির লোককে একটু শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম।

আজকাল বধূহত্যার ব্যাপারে পুলিশকে কঠোর হতেই হয়। সরাসরি হত্যা না হলেও প্ররোচনা বলে অ্যাকশান নিতে হয়। যীশু অগত্যা শিখার স্বামী, দেওর, ননদ সবাইকে গারদে পুরল। খবরের কাগজে বিরাট হৈ-চৈ।

যীশু বড়বাবুকে একদিন বলল স্যার, এসব কী হচ্ছে? কোনো বউ আত্মহত্যা করলেই তার শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের পাকড়াও করা যে সিস্টেমে দাঁড়িয়ে গেল।

উপায় কী? সরকার এ ব্যাপারে ভীষণ পার্টিকুলার।

এই সব পাবলিসিটির ফলে মেয়েদের কি আতঙ্ক বাড়ছে না বিয়ে সম্পর্কে?

বাড়ছে। কিন্তু আমাদের অ্যাকশন নিতেই হবে। উপায় নেই।

বকুল কি এসব খবর পড়েই তাকে ভয় পায়? যীশু অনেক ভাবল। হতেও পারে।

আবার কমল এল একদিন।

আপনি কিছু করছেন না।

করছি। খুনী অ্যাবসকন্ড করে আছে। সময় লাগবে।

কমল ভারী হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল, ধরা পড়বে না। আমি জানি। সব খুনী ধরা পড়ে না।

বকুলহীন জীবন, মানে মেয়েহীন জীবন। যীশু বকুল ছাড়া আর কোনো মহিলার সংস্পর্শেও আসেনি কখনো তেমন করে। সেই উষরতার মধ্যে কমল যেন পদ্মগন্ধ নিয়ে আসে। আজকাল সে কুমারী সাজে। বৈধব্যের রোগ সেরে গেছে। চোখ দুখানা থেকে সরে গেছে শোক আর ত্রাস। কমলের দুখানা চোখ এত করুণ, এত সুন্দর যে, যীশু ভাল করে তাকাতে পারে না। ভিতরে ভিতরে কী যেন হয়।

আপনি যাদি না পারেন তবে অন্য কাউকে কেসটা দিন না।

এ কথায় যীশু যথেষ্ট অপমানিত হয়েছিল। কিন্তু রাগেনি। শুধু বলল, পারলে আমিই পারব মিস ঘোষ। আপনি বাড়ি যান।

অজয় শুধু যে সাধুপুরুষ ছিল না তা বুঝতে বুদ্ধিমান যীশুর বিশেষ দেরি হয়নি। সে একদিন অজয়ের মস্তান ভাই বিজয়কে ডাকিয়ে আনল থানায়।

আপনার দাদার সম্পর্কে কিছু ইনফর্মেশন চাই।

বিজয় একটু তেড়িয়া হয়ে বলল, সবই তো জানিয়েছি।

যীশু মাথা নেড়ে বলল, আরও কিছু আছে।

বিজয় সপাটে বলল, আর কিছু নেই। আপনারা কেসটা বরং ড্রপ করুন। আমরা আর দাদার ব্যাপারে মাথা ঘামাতে চাই না।

কেন চান না?

আমরা ঝামেলা চাইছি না।

আপনারা না চাইলেই যে কেসটা বন্ধ হয়ে যাবে তা তো নয়। ফৌজদারী মামলা, পুলিশ কেস। আপনাদের ইচ্ছেয় কিছু হবে না।

আপনারাই বা কেন কষ্ট করছেন? ছেড়ে দিন।

যীশু ছাড়েনি।

অজয়ের বিষয়-সম্পত্তির পরিমাণটা তার কাছে গোলমেলে ঠেকেছিল। প্রাথমিক অ্যাসেসমেন্ট-এই ধরা পড়েছিল, মৃত অজয়ের যথেষ্ট টাকা আছে। সে একটা অফসেট প্রেস চালাত এবং ভাল আয় করত। চাকরিটাও খারাপ ছিল না।

যীশু প্রেস থেকে একদিন একটা ছেলেকে তুলে আনল। কম্পোজিটার একটি ছেলে। তাকে জেরা করতেই বেরিয়ে পড়ল পিন আপ গার্লদের দিয়ে প্যামফ্লেটের খবর এবং কয়েকটা নমুনা। ক্রমে অজয়ের ফলাও চোরাই চালানের ব্যবসার কথাও জানতে পারল।

ফের একদিন বিজয়কে ঘরে আনল যীশু।

আপনার দাদার ব্যবসাতে আপনার শেয়ার কত ছিল?

ফিফটি পারসেন্ট।

কল গার্লদের ব্যবসাতেও?

কল গার্ল! কী বলছেন?

আপনার দাদা ব্যবসা করতেন। প্রমাণ আছে।

বিজয় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, মিথ্যে কথা।

যীশু একটা রুল তুলে নিয়ে বিজয়কে পেটাল। একেবারে আচমকা এবং

নির্মম ভাবে। চুল ধরে মাথাটা টেবিলে নামিয়ে রেখে তারপর।

বিজয় মারের চোটে দিশাহারা হয়ে গেল। দু একবার মারছেন কেন, মারছেন কেন বলেই বাপ রে মা রে করে অসহায়ভাবে আর্তনাদ করতে লাগল।

এবার বলো।

বিজয় ফোলা ফোলা মুখচোখে বসে হাঁফাচ্ছিল। যেন এক বিভীষিকা দেখছে এরকম চোখে যীশুর দিকে তাকিয়ে বলল, ব্যবসা দাদা করত। আমি বারণ করেছিলাম....

যীশু রুলটা ফের তুলে বলল, এবার কিন্তু এত অল্পে তোমাকে ছাড়ব না।

বিজয় মাথা নামিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

তারপর বলল আমরা দুজনেই করতাম।

আর স্মাগলিং ?

করেছি।

এখনো করেন ?

আর কী করব ?

অজয়বাবুর চাকরিটার জন্য আপনি কি একজন অ্যাপলিকাণ্ট ?

হ্যাঁ। চাকরিটা হবে। হলে ছেড়ে দেবো সব ব্যবসা।

স্মাগলিং...এর একটা রিং আছে। নামগুলো বলুন।

বিজয় কাতর স্বরে বলল, স্যার, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।

ওরা যদি নাও মারে, আমি মারব। বলুন।

বিজয় অগত্যা নাম ঠিকানা সবই বলেছিল।

সাতজনকে তুলে আনল যীশু। তিনজনকে পাওয়া গেল না। সেই সাতজনকে জেরা করে খবর বের করে আরও দুজনকে।

তার হবু স্বামী যে একজন স্মাগলার এবং মেয়েমানুষের দালাল ছিল এ কথাটা সহজে নেয়নি কমল। তবু মৃত তথাকথিত স্বামীর প্রতি তার এক অকারণ আনুগত্যকে ভেঙে দেওয়ার জন্যই খবরটা তাকে দিয়েছিল যীশু।

আরও তিনদিনের মাথায় ক্লু ধরে খবর সংগ্রহ করে করে অবশেষে একটা ঝুপড়ি এলাকার ঘর থেকে খুনীকে ধরে আনল যীশু।

তার নাম সামু। ছেলেটা পেশাদার গুণ্ডা-মস্তান নয়। কিন্তু খুব তেজী। সাঙ্ঘাতিক সাহস।

সত্যি বলতে কী অপরাধীদের জগতে এত সাহসী আর তেজী বড় একটা দেখেনি যীশু।

সামুকে ধরতে গিয়ে যথেষ্ট নাকাল হতে হয়েছিল যীশুকে। রীতিমত লড়তে

হয়েছিল ঝুপড়িবাসী সামুর সমর্থকদের সঙ্গে। অন্তত দুখানা বড় সাইজের পাথরের ঘা খেয়েছিল যীশু। মাথার পিছনে অনেকটা কেটে গিয়েছিল। বাঁ কব্জিতে চোট লেগেছিল জোর। আশ্চর্যের বিষয় সামু গুলি চালায়নি। খুবই বিবেচনার কাজ। কারণ সে গুলি চালালে পুলিশও চালাত, আর তাতে ঝুপড়ির কিছু নিরীহ লোক মরত বা হাসপাতালে যেত। সামু ঝুপড়িবাসীদের অতিশয় প্রিয়পাত্র এবং নেতা গোছের মানুষ। সেই জনপ্রিয়তা তো আর এমনিতে হয়নি, এই সব সদ্বিবেচনার জন্যই হয়েছে।

দরজা ভেঙে যখন ঘরে ঢুকল যীশু, তখন তার হাতে রিভলভার নাচছে, চোখে খুনিয়া দৃষ্টি। একটু এদিক ওদিক হলেই ফুঁড়ে দিত সামুকে। কিন্তু যার জন্য এত, সেই সামু একটা নড়বড়ে চৌকির ওপর মলিন বিছানায় আসনপিঁড়ি হয়ে বসে। গালে কিছু দাড়ি হয়েছে, মাথার চুল কাঁধ ছাড়িয়ে নেমেছে। মেরুদণ্ড টান টান করে বসে সোজা তার দিকে তাকিয়েছিল।

সেই চোখে চোখ পড়তেই যীশু ঘেমে গেল। তার চোখ দেখে কেন লোকে ভয় পায় তা যেন সামুর চোখ দেখে যীশু প্রথম বুঝতে পেরেছিল। চোখের ভিতরে কী যেন ধকধক করে তার। সেই ধকধকানি সেদিন সামুর চোখেও দেখতে পেল যীশু। ও চোখ যেন তার চোখেরই অনুবাদ।

দুই জোড়া চোখের সেই কয়েক মুহূর্তের সংঘর্ষ আজও যীশুর এত স্পষ্ট মনে পড়ে যে, যখন তখন তার মনে হয়, সামু তার দিকে অলক্ষ্য থেকে চেয়ে আছে।

কনস্টেবলরা সামুকে চোখের পলকে ধরে ফেলল। সামু কোনো বাধাই দেয়নি। একটি কথাও বলেনি। যখন সামুকে তারা নিয়ে আসছে তখন বাইরে সার সার লোক দাঁড়ানো। অনেকের হাতেই লাঠি এবং পাথর। এমন কি মেয়েদের হাতেও।

যীশু চিৎকার করে সবাইকে সাবধান করে দিল, সামুকে খুনের অভিযোগে আমরা গ্রেফতার করছি। আপনারা পুলিশের কাজে বাধা দেবেন না। তাহলে কিন্তু গুলি চলবে।

কেউ বাধা দেয়নি।

তখনো জানকী আসরে নামেনি। জানকী তখন ছিল না।

কেউ বলে জানকী সামুর রক্ষিতা, কেউ বলে বউ। সামু বা জানকীর মতো নারীপুরুষ সমাজের যে স্তরে অবস্থান করে সেখানে রক্ষিতা বা বউ দুই-ই সমার্থক শব্দ। বিয়ে নামক একটা অনুষ্ঠান কখনো হয়, কখনো বা হয় না। কিন্তু তাতে কিছুই এসে যায় না।

সামু ছেলেটা ছোটোখাটোই এবং শরীরটাও তেমন কিছু তাগড়াই নয়। পরে

ধরা পড়েছিল, তার পেটে দুরারোগ্য আলসার ছিল। লাংসেও ছিল কিছু সন্দেহজনক স্পট। কিন্তু সে তো পরের ঘটনা।

লক আপে ঢুকিয়ে দেওয়ার পর সামু খুব শান্তভাবেই ধুলোমাখা মেঝের ওপর তেমনি আসনপিঁড়ি হয়ে শীড়দাঁড়া সোজা রেখে বসল। মুখে উদ্বেগের চিহ্ন নেই। ঠোঁট দুটো বজ্র আঁটুনিতে আবদ্ধ। একটিও শব্দ নেই।

বিচক্ষণ বড়বাবু যীশুকে বললেন, ট্রাবল দেবে হে। একটু খোঁজ খবর নাও, পুলিশে কী রেকর্ড পাও দেখ। এ হার্ড নাট টু ক্র্যাক।

সামুকে ভাঙা যে সহজ হবে না তা এক নজরেই বুঝে গিয়েছিল যীশু। তবে ভাগ্য ভাল, কোনো রাজনৈতিক দল সঙ্গে সঙ্গে সামুর পক্ষ নিল না। তার কারণ একটিই, সামু ইদানীং নিজেই নেতা হওয়ার চেষ্টা করছিল। নিজস্ব দল তৈরির জন্য তোড়জোড় শুরু করেছিল। ফলে বড় দলগুলোর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে।

সামুকে ধরার পরদিনই যীশু কমলকে খবর দিতে গেল।

মিস ঘোষ, সাসপেক্ট ধরা পড়েছে।

কমল কেমন যেন বিহ্বল চোখে চেয়ে দেখল যীশুর দিকে। তারপর বলল, আমি ওকে একবার দেখতে চাই।

যীশু হাসল, আমি তো বলেইছিলাম, আইডেন্টিফিকেশন প্যারেডের আগেই আমি চিনিয়ে দেবো। বিকেলে আসুন থানায়, দেখতে পাবেন।

লোকটা কেমন?

আপনি তো তাকে একবার দেখেছেন।

সেটাকে কি দেখা বলা যায়? একগাদা লোকের ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ দুটো লোক ভুঁইফোড়ের মতো সামনে এসে দাঁড়াল। তারপরই একটা বোমার শব্দ। চারদিকে দৌড়োদৌড়ি, চেঁচামেচি। আর তারপর....

যীশু বলল, সেসব কথা ভেবে এখন উত্তেজিত হবেন না। ঠাণ্ডা মাথায় লোকটাকে মনে করার চেষ্টা করুন।

কমল কেমন যেন তার বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। দুটো চোখে কান্না থমথম করছিল। তারপর বলল, ওর ভাই বিজয় এসেছিল।

কার ভাই?

অজয় সাধুর ভাই।

ও। সে কী চায়?

আপনাকে বলা উচিত কিনা ভাবছি।

যীশু মৃদু একটু হেসে বলল, আপনি না বললেও বুঝতে আমার অসুবিধে

নেই। সে বোধ হয় কেসটা হাশ আপ করতে চায়।

কমল ভারী অবাক হয়ে দুটো বড় বড় চোখে ভাল করে যীশুকে দেখল।

কী করে বুঝলেন ?

অজয় সাধুর অসাধু ব্যবসাতে বিজয় ছিল পার্টনার। খুব অ্যাকটিভ পার্টনার। সামু ধরা পড়ায় এখন আরো অনেক গুপ্ত খবর বেরোবে। বিজয় তা স্বাভাবিকভাবেই চায় না। তার ওপর প্রাণের ভয়ও আছে। সামুর পুরো দলটাকে আমরা ধরিনি। ধরা সম্ভবও নয়। বিরাট গ্যাং। তারা তক্কে তক্কে আছে। কাজেই আপনি না বললেও আমি আন্দাজ করতে পারি।

কমল খুব নিবিড় চোখে যীশুর দিকে চেয়ে থেকে বলল, হ্যাঁ, বিজয় সেই কথাই বলতে এসেছিল। সেদিন ওদের বাড়িতে যখন গেলাম তখন একরকম ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল। কাল এল একদম ভেজা বেড়ালের মতো। দিদি বলে ডাকল, কথার সুর ভীষণ নরম। বলল, ওদের ওপর পুলিশের হামলা হচ্ছে, আমাদের ওপরেও হবে আমরা যেন কেসটা নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি না করি।

যীশু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এরকমই হয়। অনেক খুনের কিনারা এইভাবেই আর হয়ে ওঠে না। কিন্তু আপনি কি সত্যিই তাই চান ?

কমল এ কথার জবাব দিল না। মোড়ায় একটু নিচুতে বসে সে চেয়ারে বসা যীশুর দিকে গভীর চোখে চেয়ে বলল, আপনাদের খুব বিপদের মধ্যে সময় কাটাতে হয়। না ? এই যে সব খুনী গুণ্ডার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন, ওরা সুযোগ পেলে কি ছেড়ে দেবে আপনাকে ?

যীশু মাথা নেড়ে সহাস্যে বলল, না। বাগে পেলে ছিঁড়ে ফেলবে। কিন্তু সেটুকু জব হ্যাজার্ড আমাদের মেনে নিতেই হয়।

বিজয় আপনার কথাও অনেক বলল। আপনি নাকি সাঙ্ঘাতিক লোক। অনেক খুন করেছেন। আপনার ভয়ে সবাই কাঁপে। সত্যি ?

জানি না। আমি কাজটা মন দিয়ে করি, এইমাত্র।

বুঝতে পারছি। আপনি আজ টুপিটা খুলছেন না কেন ? মাথার ব্যাণ্ডেজটা আমি দেখতে পাবো ভয়ে ? ব্যাণ্ডেজটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে। কী হয়েছিল ?

সামুর ভক্তরা ইঁট মেরেছে। ও কিছু নয়, জব হ্যাজার্ড।

আর কব্জি ?

একই ঘটনা।

তবু ভয় করে না ? ইঁটের বদলে তো গুলিও ছুঁড়তে পারত !

পারত। কিন্তু সে ভয়ে তো আর হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না।

আপনার লজিক বেশ সহজ আর সরল। তাই না?

হ্যাঁ। আমরা জটিল হলে মুশকিল।

কমল খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে বসে রইল। তারপর বলল, লোকটার কি ফাঁসি হবে?

কি করে বলি? কেস আগে সাজানো হোক, কোর্টে উঠুক।

তারপর তো সাত আট বছর ধরে মামলা চলবে!

অত না হলেও সময় লাগবে বৈকি।

লোকটা জামিন পাবে?

পেতে পারে। খুঁটির জোর কতটা তার ওপর নির্ভর করে।

শেষপর্যন্ত লোকটা ছাড়াও পেয়ে যেতে পারে তো।

ঠিকমতো সাক্ষীপ্রমাণ পাওয়া না গেলে তো ছাড়া পেতেই পারে।

কমল মাথা নেড়ে বলল, অজয় সাধুর বাড়ির লোকই তো চাইছে না যে লোকটার শাস্তি হোক।

যীশু মাথা নেড়ে বলল, সেটাই তো হয়েছে মুশকিল। যাকগে আগাম ভেবে কী করবেন? আপনাদের তরফ থেকে গণ্ডগোল যদি না হয় তাহলে সামু ছাড়া পাবে না।

সামু কি লোকটার নাম?

হ্যাঁ।

কী ধরনের নাম?

যীশু একটু হাসল, নামের কি কোনো মানে আছে? এর নাম সামু পেরেরা। হয়তো অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ব্লাড লাইন আছে, না হয় তো বাপ ঠাকুর্দা কেউ খ্রীস্টান হয়েছিল। জাতজন্মের কিছু ঠিক নেই।

বউ বাচ্চা আছে?

বউ মানে একজন মেয়েমানুষ আছে শুনেছি। জানকী। সম্ভবত ইউ পি বা রাজস্থানের মেয়ে। বাচ্চা নেই। এত সব জেনে কী হবে?

কৌতূহল। লোকটার বয়স কেমন?

চব্বিশ পঁচিশ।

অজয়কে ও কেন মারল কিছু জানতে পারলেন?

কিছুটা জানি। স্মাগলিং চ্যানেল-এর দখল নিয়ে লড়াই। যাকে গ্যাং ওয়ার বলা যায়। দু পক্ষ অনেককাল ধরে কলিশন লাইনে ছিল। যতদূর খবর রাখি ঘটনার দু সপ্তাহ আগে বিজয় আর তার দলবল সামুর দলের দুজনকে খুন করে। এটা তারই বদলা।

কিন্তু বিয়ের দিন কেন ? আর বিয়ের আসরেই বা কেন ?

হয়তো সামু একটু নাটক পছন্দ করে। বেপাড়ায় বিয়ের আসরে ঢুকে অত লোকের সামনে খুন করে যাওয়ার মধ্যে একটা নাটকীয়তা তো আছে। সময়টাও বেছে নিয়েছিল চমৎকার। শুভদৃষ্টির আগে, বর যখন নতুন বউয়ের মুখ দেখতে যাচ্ছে। ড্রামাটিক মোমেন্ট।

কমল একটু শিউরে উঠে খানিকক্ষণ চোখ বুজে রইল। হয়তো সেই মুহূর্তটির কথা ভেবে নিল সেও। জীবনের এক রহস্যময় পর্দা সরে যাওয়ার আগের মুহূর্তটি। তারপর জিজ্ঞেস করল, ওর আরো দুজন সঙ্গী ছিল তাদের কী হল ?

অ্যাবসকন্ডিং। তবে তারাও ধরা পড়বে। এসব ক্ষেত্রে টাইম ফ্যাকটারটিকে না মেনে উপায় নেই। দুজনের নামই আমরা পেয়ে গেছি। নান্টু আর কাজল। তাদের বিরুদ্ধে মার্ডার চার্জ আনা যাবে না, শুধু অ্যাকসেসরিজ টু মার্ডার। যতদূর খবর রাখি নান্টু আর কাজল আজ অবধি তেমন বড় কোনো ক্রাইম করেনি, শুধু সামুর সাকরেদি করত।

বিজয় এত ভয় পাচ্ছে কেন ? ওর কি কিছু হবে ?

যীশু সামান্য হাসল, হতেই পারে।

তাহলে আপনি কেন ভয় পাচ্ছেন না ? এত সাহস কেন আপনার ?

আপনি উল্টো কথা বলছেন। আমার তো ভয় পাওয়ার কথাই নয়। আমি তো ল অ্যাণ্ড অর্ডারের লোক, আমাকেই ওরা ভয় খাবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

কমল মাথা নেড়ে বলল, অত সাহস ভাল নয় যীশুবাবু। আপনি সাবধানে থাকবেন। আপনার বড্ড বেশি সাহস।

এ কথায় যীশুর বুকটা কি একটু দুলে উঠল ? বলতে গেলে জীবনে এই প্রথম একটি সুন্দরী তরুণী তার জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল। আর চাউনি দিয়ে সারাক্ষণ সিক্ত করে দিল তাকে। বকুল তো এ জিনিস দিতে পারত। দেয়নি।

যীশু বলল, আপনি তো শুধু একটা কেস দেখেই আমার জন্য ভয় পাচ্ছেন। এরকম কত কেস করতে হয়েছে জানেন ? আমাদের ভয় পেলে চলে না।

আমি শুনেছি, আপনি অন্যরকম। আপনার সাহস বড্ড বেশি।

আমি জানি না আমি কেমন।

যীশুর বুকের মধ্যে, তার পাথুরে বুকের মধ্যে সেই যে একটা থিরথির কাঁপন শুরু হয়েছিল আজও তার রেশ রয়ে গেছে। কমলের দুখানা চোখ আজও যেন তার অভ্যন্তরে চেয়ে থাকে। তার সর্বাঙ্গ লেহন করে আশ্লেষে, আবেগে,

মুগ্ধতায়।

স্টেশন এসে গেছে। খাড়া দুপুরের রোদে যীশু স্টেশনে নামল। প্রচণ্ড খিদে টের পাচ্ছে সে। জলতেষ্টাও।

স্টেশনের বাইরে টিউকলে জল খেতে গিয়ে অমৃতলালের সঙ্গে দেখা।

লোকটা নির্লজ্জ আছে। দাঁত বের করে হেসে বলল, এই যে ভায়া! এই গাড়িতেই এলে তাহলে! কী কাজ ছিল বলছিলে যে! দাঁড়াও, আমি পাম্প করে দিই, তুমি আঁজলা ভরে জল খাও।

অমৃতলাল পাম্প করে দিল। অনেকটা লোহাগন্ধী জল খেয়ে নিল যীশু। বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, চারদিকটা চকচক করছে জলে।

যীশু ভায়ার কি সাইকেল আছে? নইলে আমার সাইকেলে ডবলক্যারি করে পৌঁছে দিতে পারি।

যীশু বলল, দরকার নেই। আমার সাইকেল আছে। আপনি যান। আমি একটু বাদে যাচ্ছি।

পরেশ ভায়া নাকি বাই ইলেকশনে নামছে! কিছু শুনেছো?

না তো!

পার্টি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের চেষ্টা করছে। নমিনেশন না পেলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নামবে।

উদাসভাবে যীশু বলল, হবে। আমি ওসব জানি না।

লোকটা চলে গেলে যীশু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর দোকান থেকে সাইকেলটা নিয়ে মেটে রাস্তার শর্টকাট ধরল।

ছেলেবেলায় এই রাস্তায় বহুবার সাইকেল চালিয়ে স্টেশনে এসেছে। এখন মাঝে মাঝে মাটি বসে গিয়ে নানা খানাখন্দ হয়েছে। দুধারে গাছপালা গহিন হয়েছে আরো। ছিপটির মতো গায়ে লাগে। বন্য গন্ধে ম' ম' করছে চারদিক। এখনো বেশ নির্জনতা আছে এখানে। কাদার মধ্যে মাঝে মাঝে গেঁথে যাচ্ছে সাইকেলের চাকা। রাস্তাটায় আজকাল লোক-চলাচল নেই। দুধারেই অনেকটা পতিত বসতিহীন জমি আগাছায় ভরে আছে। বর্ষায় জলের জো পেয়ে গাছপালা ফনফন করে উঠছে। এসব আগাছার জন্য সার লাগে না, পোকা মারার বিষও লাগে না। দিব্যি গজায় বাড়ে, ফল-ফুল হয়।

ডাঙা জমি দিয়ে একটা ধীরগতি মাঝারি সাপ রাস্তা পেরোচ্ছিল। চন্দ্রবোড়া। যীশু সাইকেল থামাল না। ওপর দিয়ে সড়াক করে চালিয়ে দিয়েই পা দুটো ওপরে তুলে নিল। মুখটা একটু তুলেছিল সাপটা। ছুবলে দিতও হয়তো। পারল না। যীশু এগিয়ে গিয়ে পিছনে তাকাল। মেরুদণ্ড বড্ড নরম

প্রাণীটার। ছটফট করছে।

যীশু চলে যেতে গিয়েও ফিরল। জখমি সাপ ভয়ংকর হয়। নিকেশ করে দিয়ে যাওয়াই ভাল। সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে ফিরে এল যীশু। গলা বরাবর সাইকেলটা চালিয়ে দিল। একবার। ফের মুখ ঘুরিয়ে আর একবার। সাপটা চিৎ হয়ে গেল। নড়ছে না।

যীশু সাইকলেটা নিয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা একটু দেখল। কপালে ঘাম জমছে তার। বৃষ্টির পর কড়া রোদ উঠেছে। চারদিক বড্ড ঝলমল করছে।

সাপটাকে মারা ভাল হল কিনা কে জানে। ছেলেবেলায় তারা সাপ মারত না। মারা বারণ ছিল। ছেলেবেলায় যীশু মানুষও মারত না।

বউদি!

ওমা! কী ছেলে রে বাবা! কলকাতায় যাবে একবার বলে যাবে তো! তোমার দাদার কাছে শুনলুম হঠাৎ কলকাতা চলে গেছ। আমি না খেয়ে বসে আছি সকাল থেকে।

খেয়ে নাওনি কেন?

মুখে রোচে বলো! রোজ দুপুরে কী হয় জানো?

কী হয়?

একা হয়ে যাই তো। শ্বশুরমশাই বেলা এগারোটায় খেয়ে নেন। তোমার দাদা বারোটায়। লাভ্‌লি তো সেই সকালে খেয়ে স্কুলে যায়। আমি দুপুরে একা একা কিছুতেই খেতে পারি না। ভাত মাখি আর মাখি। গলা দিয়ে নামাতে পারি না। তারপর হাত ধুয়ে এক পেট খিদে নিয়ে উঠে পড়ি। তুমি থাকাতে আজকাল গল্প করতে করতে দুটি তাও খাচ্ছি।

বটে! তবে দু মিনিট সময় দাও। পুকুরে দুটো ডুব দিয়ে আসি।

বর্ষার জল ভাল নয়। কুয়ো থেকেই বরং দু বালতি তুলে মাথায় ঢালো। পুকুরটায় না গেলে। বড্ড জঙ্গল আর কাদা চারধারে। মজেও আসছে।

যীশু তবু পুকুরেই গেল।

স্নান করে এসে খেতে বসে যীশু বলল, বউদি, সাপ মারা কি খারাপ?

মেরেছো নাকি?

হুঁ। আগে মারতাম না। জ্যাঠা বাবা সবাই বারণ করত।

তোমার দাদাও মারতে দেন না। এ বাড়িতেই তো গোটা দুই তিন আছে। ভয়ে মরি। তবে বাস্তু সাপ, কিছু করে না। তুমি কোথায় মারলে?

রাস্তায়। সাইকেলে চাপা পড়েছিল।

ছোটো মাছ দিয়ে খেতে অসুবিধে হবে? এখানে তো জানো, মাছ-টাছ ভাল

পাওয়াই যায় না।

জানি। তোমাকে আর লজ্জা পেতে হবে না।

খুব লজ্জা দিয়েছো ভাই সকালে। কুমড়োর ঘ্যাঁট করেছি বলে তো রুটি খেতেই পারলে না। নাক কান মলছি, আর কুমড়ো রাঁধবো না।

যীশু অনেক ভাত খেল। বাসন্তী বউদির রান্নার হাত চমৎকার, একটু ঝাল হয়, এই যা।

দুপুরে কী করবে ভাই? ঘুমোবে?

অভ্যেস নেই। দুপুরে কী করে যে লোকে ঘুমোয়। তুমি কী করবে?

আমার সব সইয়েরা আসে, লুডো খেলি।

রোজ?

রোজ। গল্পগাছাও হয়।

লুডোর নাম করে বসে যত কূটকচালি না?

তা ভাই মেয়েমানুষ তো একটু এসব করবেই। নইলে পেটের ভাত হজম হবে কিসে? এখন আবার তুমি এসেছো, তোমাকে নিয়েই যত কথা।

যীশু অবাক হয়ে বলে, আমাকে নিয়ে কী কথা?

সবাই তোমার সম্পর্কে জানতে চায় যে।

কী জানতে চায়?

তার কি কোনো ঠিক আছে? সবকিছুই জানতে চায়। এমন কি তুমি কী খেতে ভালবাস, ঘুস কত পাও, বউকে মারো কিনা।

যীশু হাসল। ঘটি থেকে আলগা করে জল খেয়ে বলল, আর তুমিও সব বলে দাও?

না, সব কি বলতে পারি? জানিই বা কতটুকু? তবে—

তবে কি?

আমার চেয়েও তোমার সম্পর্কে ওরা বেশি খবর রাখে।

যীশু একটু চমকে উঠে বলল, কী খবর রাখে?

বাসন্তী সামান্য অস্বস্তি বোধ করল। তারপর বলল, তোমাদের থানায় কে একটা লোক লক আপ-এ মারা গেছে যেন। খবরের কাগজে নাকি লিখেছিল, যীশু বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সত্যি নাকি?

খবরটা যে চাপা নেই তা যীশু জানে। তাই খুব বেশি অবাক হল না। বলল, হ্যাঁ বউদি। খবরটা ঠিক। আমাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। হয়তো চাকরি যাবে, মেয়াদ হবে।

বাসন্তীর চোখ দুটো খুব করুণ হয়ে গেল। একটু চুপ থেকে বলল, আমার কী

মনে হয় জানো ?

কী বলো তো !

তোমার কিছু হবে না। তুমি তো খারাপ লোক নও। এক পয়সাও ঘুস খাওনি আজ পর্যন্ত। তোমার দাদা বলে, যীশুটা দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।

ঘুস না খাওয়াই তো বড় কথা নয় বউদি। মানুষ কতভাবে যে ফেঁসে যায়।

না পোষালে চাকরিটা না হয় ছেড়েই দাও না কেন। তোমার ভাগে যা জমিজামা আছে এখানে চাষবাস করো এসে। তোমার দাদারও তাতে সুবিধে হয়। পলিটিক্স করে করে লোকটা তো হয়রান হয়ে গেল। একটা ছেলে অবধি নেই যে, দেখাশোনা করে। জমিজমা উড়েপুড়ে যাচ্ছে, পাঁচ ভূতে লুটে খাচ্ছে। তুমি শক্তসমর্থ একজন লোক এসে যদি পাশে দাঁড়াও তাহলে তোমার দাদা একটা জো পায়।

যীশু থালার ওপর আঙুল দিয়ে আঁকিবুঁকি কাটছিল। বলল, সব কিছু কি সকলের পোষায় ? চাষবাস আমার ধাতে নেই। ওই নোংরা শহর কলকাতা, ওখানে চোর গুণ্ডা বদমাশদের পিছনে পিছনে ঘুরতে ঘুরতে নেশা ধরে গেছে।

আমাকে একবার কলকাতায় নিয়ে যাবে ? বকুলকে গিয়ে একটু বোঝাবো।

লাভ নেই। বরং বকুলকে নিজেকেই বুঝতে দাও। থানায় ফোন করেছিলাম। বড়বাবুর কাছে শুনলাম, বকুল আর তার বাবা থানায় গিয়ে আমার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিচ্ছে।

কেন ?

বোধহয় ডিভোর্সের মামলা করবে।

যীশু উঠে পড়ল। তারপর ছিপ নিয়ে পুকুরের ধারে গিয়ে একটা জলচৌকি পেতে বসল। একভাবে না একভাবে সময়টা কাটাতে হবে।

জামগাছের আড়ালে সূর্য ক্রমে লাল হয়ে উঠছিল। মেঘ ঘনিয়ে উঠছে অন্য ধারে। যীশুর বঁড়শির চার ঠুকরে খেয়ে যাচ্ছে মাছ। গিলছে না। যীশু শুধু আনমনে বসে আছে। একটা কুকুর দশ হাত তফাতে বসে তাকে দেখে দেখে লেজ নাড়ছে। অনেক ফড়িং উড়ছে আশেপাশে।

ছিপ হাতে নিমগাছে হেলান দিয়ে একটু ঢুলুনী এল যীশুর।

চটকা ভাঙল বউদির ডাকে—এসো। চা খাবে না ?

যীশু ছিপ গুটিয়ে উঠে এল।

বারান্দায় হরকালী তাঁর চেয়ারে বসে আছেন। একটু তফাতে জলচৌকিটা পেতে বসল যীশু। হাতে চায়ের কাপ।

হরকালী তার দিকে চেয়ে বললেন, কাছে আসো বাবা। শহরে গিয়েছিলে ?

হ্যাঁ।

কথা টথা কি হল ?

হল জ্যাঠা।

তুমি বাপা, একটু বিপদের মধ্যে আছো।

হুঁ।

খুব বিপদ ?

চাকরিটা থাকবে কিনা সন্দেহ।

লোকে আকথা কুকথা বলে, বড় ভয় হয়।

ঠিকই বলে জ্যাঠা। লক আপে যে লোকটা মরেছিল তাকে আমিই—

কাজটা ভাল হয় নাই বাপা। লোকে কেউ মরতে চায় না। কেউ চায় না। মানুষ মারা খারাপ, জীবজন্তু মারা খারাপ। মাঝে মাঝে গীতা পড়তে পারো না ? পড়ো, ও পড়া খুব ভাল। বুকে বল পাবা।

যীশু চুপ করে রইল।

হরকালী মুখের আস্ত হর্তুকীটা নাড়তে লাগলেন ঘন ঘন। এটা তাঁর মানসিক উত্তেজনার লক্ষণ।

বাপা, তোমার বাবার কথা মনে পড়ে ?

পড়ে জ্যাঠা।

তেজ ছিল খুব। লাঠিবাজিতে খুব পাকা। আবার মনটা নরম ছিল তেমনই।

জানি।

নরমে গরমে হওয়া লাগে। তোমার কি খুব রাগ বাপা ?

না জ্যাঠা। তবে মাঝে মাঝে—

পাজি লোককে নিয়েই তো তোমার কারবার। দুনিয়াটা পাজিতেই তো ভরা। যাকে মারছি সে কেমন লোক ছিল বাপা ?

ভাল লোক নয় জ্যাঠা।

এখন তো সে ভালমন্দের পার।

হ্যাঁ। মন্দের মধ্যে হয়তো ভালও ছিল একটু। সেটা উস্কে তুললে হয়তো ভালই হত। মারে ফেললে আর কিছু হবার জো নাই। রাগটাকে সামাল দিতে হয় খুব। রাগ বড় বৈরী।

যীশু চায়ে চুমুক দিল। আনমনা। বড় আনমনা। গাঁয়ে বিষণ্ণ বিকেল নেমে এসেছে। ইলেকট্রিকের কোনো নিশ্চয়তা নেই বলে বারান্দার কোণে একটা বউমতো কাজের লোক বসে ছাই দিয়ে চিমনি মুছছে। সন্ধের পরটা যীশুর কেমন যেন বড্ড একা লাগে। এখানে আলোর চেয়ে অন্ধকার অনেক বেশি।

যেমন ঠিক যীশুর ভিতরটা।

সেই অন্ধকার থেকেই সামু পেরেরা মাঝে মাঝে ধীর পায়ে যেন এক দীর্ঘ সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসতে থাকে।

যীশু বিশ্বাস, আমি সামু পেরেরা।

সামু, আমি আইন নিজের হাতে তুলে নিতে চাইনি।

তুমি জবরদস্ত পুলিশ অফিসার যীশু বিশ্বাস, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। কিন্তু জানো কি কাকে বাঁচাতে আমাকে খুন করতে হল তোমার? কে বাঁচল যীশু বিশ্বাস? তুমি? না আমি? না অজয় সাধু?

কেউ বাঁচল না। কিন্তু তুমি মুখ খুললে না যে। আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে তুমি ঠিক বেরিয়ে যেতে। তাই আমি তোমার কনফেশন চেয়েছিলাম।

অত সহজ কি যীশু বিশ্বাস? সামুর গলা দিয়ে কথা টেনে বের করবে তত এলেম কি তোমার আছে? তুমি কি টের পাওনি যে সামু অন্য ধাতে গড়া! যেদিন ধরেছিলে সেদিনই কি টের পাওনি, সামু সোজা লোক নয়?

পেয়েছিলাম সামু।

দুনিয়াতে সামুর মতো লোক কম পাবে যীশু বিশ্বাস। সামুর ধাত তুমি ভালই চেনো। কারণ তুমিও সামুর ধাতে গড়া। তুমি জানতে আমি কথা কইবো না। তবু কেন টরচার করলে? কেন পাগলামি পেয়ে বসল তোমাকে?

ওই একই পাগলামির বশে কি তুমিও চড়াও হওনি অজয় সাধুর বিয়ের আসরে? অমন সুন্দর একটা ঘটনা, তার মাঝখানে ওটা কী দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করলে বলো তো!

অজয় সাধুকে তুমি চেনো না যীশু, আমি চিনি। একটা মেয়ের জীবন বরবাদ হতে যাচ্ছিল, বাঁচিয়ে দিয়েছি। যে লোকটা মেয়ের ব্যবসা করে, চোরাই চালানদার, যে লোকটা আমাদেরই মতো, সে কেন টোপর পরে বিয়ে করতে বসবে ভদ্রলোকের মতো? তার কী যোগ্যতা ছিল?

তাহলে আগেই মারোনি কেন?

পরেও তো মারতে পারতাম। একটা মেয়ে বিধবা হত।

বিধবার চেয়ে কিছু কমও হয়নি সে। জীবনটা মাটি হয়ে গেল।

শোনো যীশু, অজয় সাধুকে বাগে পেলে ঠিকই আগেই মেরে দিতাম। কিন্তু সে গার্ড রাখত। এক রাস্তায় দুদিন যেত না। বিয়ের দিনটা কেন টারগেট করেছিলাম জানো? ওইদিন ওর গার্ড ছিল না। রাস্তা বা জায়গা বদল করার উপায় ছিল না। দু সপ্তাহ ধরে যে রাগ আর জ্বালা জমা হয়েছিল তা রিলিজ হয়েছিল ওইদিন, গুলি চালানোর পর। ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়েছিল।

বেশ সামু ? তোমরা তো এক পালকেরই পাখি।

না যীশু বিশ্বাস। আমরা এক পালকের পাখি নই। আমার হয়ে যারা কাজ করে তাদের আমি নিজের ভাইয়ের মতো ভালবাসি। দেখনি আমাকে অ্যারেস্ট করার সময় কত লোক দাঁড়িয়ে গেল তোমাকে আটকাতে। আমি জান-কবুল করে ভালবাসতে পারি। স্মাগলিং করি, যাই করি, আমরা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিই। কিন্তু সাধু বাঁটোয়ারা জানে না। তার দলের লোক তার কাছে চাকরবাকর বা কর্মচারী মাত্র। তফাতটা বুঝলে ?

হ্যাঁ, বুঝেছি।

আমার ভাইয়ের মতো বিশ্বাসী দুটো লোক ছিল। রতন আর চিন্টু। বড় ডোবার ধারে দুজনকেই মেরেছিল ওরা। তেমন কোনো অন্যায় করেনি।

জানি। আমি সব খবর রাখি।

তবু অজয়ের পক্ষ হয়ে লড়ে গেলে স্রেফ ওই মেয়েটার জন্য। আলুবাজ যীশু বিশ্বাস, তোমার ক্যারাকটার নেই।

চোপ।

আমি সামু কথা বলছি না যীশু বিশ্বাস। কথা কইছে তোমার বিবেক। কাকে চুপ করাবে ? অত সহজ নয়। তোমার ভিতরে চিরকাল আমি এইভাবে কথা বলে যাবো। কুরে কুরে খেয়ে নেবো তোমাকে।

ঘন, আঠালো, জমাট এক অন্ধকার নেমে এসেছে চারদিকে। মেঘ চমকাচ্ছে। বৃষ্টি হবে। পুকুরের দিকটায় একটানা ব্যঙের ডাক। আর জোনাকি জলছে এলোপাথাড়ি। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে।

আজ সন্ধেয় ইলেকট্রিক এল না। ঘরে ঘরে টিমটিম করছে লণ্ঠন।

জ্যাঠামশাই উঠলেন, যাই বাপা, একটু ঠাকুরের নাম করি যায়ে।

যান।

বারান্দায় চুপ করে বসে রইল যীশু। এইভাবে আজকাল তাকে অসহনীয় অবসর কাটাতে হয়। কিন্তু কাটে না। শুধু স্মৃতি এসে ভিড় করে। বুক ব্যথিয়ে ওঠে। আজকাল তার বুকের মধ্যে একটা ফাঁকা ভাব।

যীশুর চরিত্রে এসব কখনো ছিল না।

একটা টর্চের আলো পড়ল ফটকের দিক থেকে। একটা সাইকেল আসছে। উদাস চোখে চেয়ে দেখল যীশু। ফটক থেকে অনেকটা পথ। একটা বাঁক ঘুরে অন্ধকার চিরে সাইকেলটা বারান্দায় এসে ঠেকল।

যীশু নাকি রে ?

হ্যাঁ দাদা।

কলকাতায় গিয়েছিলি ?

হ্যাঁ।

অমৃতলাল বলছিল, তোর সঙ্গে ট্রেনে দেখা।

পরেশ সাইকেলটা বাইরে রেখেই বারান্দায় উঠে এল।

আমিও দুপুরের গাড়ি ধরে কলকাতা গিয়েছিলাম। আজও হল না।

কী হল না ?

পার্টির প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি কেউ নেই কলকাতায়। কতবার যে টানা মারতে হবে তাই ভাবছি।

তুমি কি ভোটে দাঁড়াচ্ছো ?

পরেশ হরকালীর চেয়ারটায় বসে বলল, একরকম সব ঠিকই তো ছিল। মাঝখানে আবার প্রাণতোষটা বাগড়া দিচ্ছে। আরও দুজন উমেদার আছে বটে, তবে তারা ধোপে টিকবে না। কিন্তু প্রাণতোষটা আর একবার নমিনেশন পেয়েছিল। হেরে ভূত। তোর কী মনে হয়, ওরা নতুন ক্যান্ডিডেটই প্রেফার করবে, তাই না ? হেরো ক্যান্ডিডেটকে কি দেবে নমিনেশন ?

কী জানি ! তুমি এম এল এ হতে চাও কেন ?

চাইবো না ? বলিস কি। এদিককার কথা কেউ ভাবে, না বলে ? অ্যাসেম্বলিতে একবার যেতে পারলে এ জায়গাটাকে ভূগোলে তুলে দেবো।

ঘরের টাকা জলের মতো খরচ হয়ে যাবে। ফ্রন্টের সঙ্গে এঁটে উঠবে না। ছেড়ে দাও।

বলিস কী ? ফ্রন্টের ক্যান্ডিডেট মৃণাল কত ভোটে জিতেছিল জানিস ? মাত্র সাতশো। তাও প্রাণতোষ জেলেপাড়ার সঙ্গে গণ্ডগোল করেছিল বলে। ওখানেই তিন হাজার ভোট খসে গিয়েছিল। আমি আঁটঘাট বেঁধেই নামছি। লোকেও চাইছে।

যীশু একটা শ্বাস ফেলল, যা ভাল বোঝো কর।

তুইও একটু ঘুরলে পারিস আমার সঙ্গে। ফিল্ডটা দেখে রাখা ভাল। এখন তো বসেই আছিস।

যীশু সামান্য দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বলল, আমার খবর সবই তো জানো।

জানি মানে খবরের কাগজে যা বেরিয়েছে। কেস কি টিকবে ? ওরকম কত হয়।

আমার বদনাম হয়ে গেছে দাদা। তোমার ইলেকশনে আমার ঘোরাঘুরি ঠিক হবে না।

পরেশ হাসল, ওরে পাগল, বদনাম বলে ধরছিস কেন ? গাঁয়ের লোক অত

বোঝে সোঝে না। তারা ভাবে ওটা বীরত্বের কাজই হয়েছে। গাঁয়ের সাইকোলজি আলাদা। গুণ্ডা বদমাশদের দাপটে সকলেরই তো হাল বেহাল। কলকাতায় আজ কী হল? কোনো খবর পেলি?

না। কাল আবার যাবো। ভাবছি একজনের সঙ্গে দেখা করার একটা চেষ্টা করব।

ভাল। মুরুব্বি টুরুব্বি ধরাই ভাল। আবার মিটিং আছে।

পরেশ উঠে ভিতরে গেল। একটু বাদেই বেরোবে।

যীশু উঠে নিজের ঘরে এল। একতলায় কোণের দিকে ঘর। দেয়ালে নোনা ধরেছে। সিলিং থেকে চলটা খসে খসে পড়ে প্রায়ই। মেঝের ফাটল। বহুকাল এই ঘরে কেউ বাস করে না। বকুলকে নিয়ে একবার বাস করে গিয়েছিল যীশু। ঠিক সেরকমই রয়ে গেছে। আর একটু মলিন আর নোংরা।

যীশু যখন তখন শুতে পারে না। তার শরীরে আলসেমি বলে কিছু নেই। বইটই পড়তেও তার বিশেষ ভাল লাগে না। অথচ কিছু না করলেই নয়। কেবল মনে পড়া আর মনে পড়ার হাত থেকে তার কিছুক্ষণ রেহাই চাই।

যীশু ঠাকুরপো। দেখ কে এসেছে। চিনতে পারো কিনা দেখ তো!

খোলা দরজার বাইরে অন্ধকারে বউদি দাঁড়িয়ে। পাশে আবছা একটা চেক শাড়ি পরা মেয়ে।

কে বলো তো!

চিনতে পারলে না?

উঃ, তুমি যা গেঁয়ো না। ওকে কি অন্ধকারে আমি দেখতে পাচ্ছি যে চিনবো।

বউদি একটু হেসে বলল, একসময়ে অন্ধকারেও চিনতে পারতে গো। তখন ভাব ভালবাসা ছিল যে!

যাঃ, বলে মেয়েটা একটা ঠেলা দিল বাসন্তীকে।

যীশু এবার চিনতে পারল।

চমক?

চিনতে পারলে তাহলে?

চমক যখন ঘরে আলোয় এসে দাঁড়াল তখন ভারী হতাশ হল যীশু। ঠিক বটে, চমকের সঙ্গে একসময়ে তার একটু সম্পর্ক হয়েছিল। সামান্যই। প্রায় সমবয়সী বলে জ্যাঠা বিয়েটা নাকচ করে দেন।

ভালই করেছিলেন। চমককে কে বলবে আর যে যুবতী? মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সেই ধসে গেছে চেহারা।

বোস এসে চমক। রোগা হয়ে গেছিস ভীষণ।

রোগা কী গো। সিলিম বলো। আজকাল তো হাড়গিলের মতো চেহারারই কদর। বউদি ঠাট্টা করল।

চমক একটু লাজুক পায়ে ঘরে এল। চারদিকে চাইল। তারপর বসলও।

কেমন আছিস চমক?

ওই একরকম। আমাদের আর থাকা।

চমকের মধ্যে একসময়ে একটা বন্য তেজী সৌন্দর্য ছিল। সেটা বয়সেরই গুণ হবে। আজ সেটা সটকে গেছে। হাতে ঢলঢল করছে কয়েক গাছা চিকন চুড়ি। গাল বসে গেছে। চোখে দীপ্তি নেই।

কটা ছেলেপুলে তোর?

চমক আবার লজ্জা পেয়ে বলল, তিনটে।

তোর বর সেই বি ডি ওর অফিসেই কাজ করছে?

আর কী করবে?

তোর কী হয়েছে চমক? এত রোগা হয়ে গেছিস কেন?

অম্বলের অসুখ। একটা অপারেশনও হল গত বছর।

যীশু চুপ মেরে গেল। কী, এত বদলে যাচ্ছে পৃথিবী। এই তো সেদিন এই মেয়েটাকে নিয়ে কত স্বপ্ন দেখেছে যীশু। আর আজ একবারের বেশি দুবার তাকাতে ইচ্ছে করছে না।

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, অনেকদিন বাদে তোকে দেখলাম।

আমার বিয়েতে তুমি আসোনি কিন্তু। এবার একদিন চলো আমার বাড়ি। কাছেই তো।

যাবো। সময় পেলে যাবো।

বউদি দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, কাল তোমাকে দেখতে মেলা লোক আসবে। সব ঘোঁট পাকাচ্ছে।

যীশু অবাক হয়ে বলল, আমাকে দেখতে আসবে। কেন বউদি? আমি কি চিড়িয়াখানার জন্তু?

তা নয় গো। এমনি আসবে।

কোনো কারণ তো থাকবে। আমাকে দেখার কী আছে? এ জায়গাতেই তো জন্মেছি, বড় হয়েছি। সবাই চেনে আমাকে।

তাহলে বোধহয় নতুন করে চিনতে চায়।

এসব ভাল নয় বউদি।

খারাপই বা কী? মেয়েছেলেরাই আসবে। দেখো, খারাপ লাগবে না। বোসো তোমরা, তোমার দাদা বেরোবে, দুটো মুড়িটুড়ি দিয়ে আসি।

বউদি চলে গেলে যীশু চমকের দিকে তাকাল। চমক ড্যাব ড্যাব করে তাকে দেখছে। কেমন যেন প্রেতচক্ষুর চাউনি। লণ্ঠনের আলোটা ঠিকমতো পড়েনি ওর চোখে। আলো ছায়ার খেলাতেই বোধহয় ওরকম দেখাচ্ছে।

ক'দিন থাকবে এখানে যীশুদা?

ঠিক নেই। হঠাৎ দাদা কপচাচ্ছিস কেন? আগে তো নাম ধরে তুই তোকারি করতিস।

হাসলে পর চমকের দাঁতের পাটি বেশ উঁচু দেখাল। আগে এরকম ছিল না তো। বলল, তখন তুমি গেঁয়ো ছিলে, ছোটো ছিলে। এখন শহুরে হয়েছো, বড়সড় হয়েছো, তাই ঠিক সাহস হচ্ছে না।

তাই বুঝি? বলে চুপ করে গেল যীশু। আর কথা এল না মুখে।

বউকে আনলে না কেন?

যীশু একটু বিব্রত বোধ করল। তারপর বলল, এমন আলটপকা এক একটা কথা জিজ্ঞাসা করিস!

ওমা! বউ আনোনি কেন একথাটা বুঝি খারাপ কিছু হল?

বউ নিয়ে অনেক কেচ্ছা রে। শুনিস পরে। বউদিই পাড়া বয়ে বলে বেড়াবে।

বউ নিয়ে তোমার আবার কী কেচ্ছা গো? কী সুন্দর বউ তোমার! ছোটোখাটো পুতুল-পুতুল। তার বুঝি অন্য কেউ আছে?

ঠোঁট উল্টে যীশু বলল, কে জানে। থাকতেও পারে। তোর যেমন আমি ছিলাম!

আহা, বড় ছিলে। এখন তো চিনতেও পারো না।

যীশু রসিকতা করেও হাসতে পারল না। হাসি এলই না। তার বরং কথাটা বলেই করুণা হল চমকের জন্য।

যীশু কিছুক্ষণ অন্য দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, গাঁয়ে আমার নামে অনেক কথা রটেছে, না রে?

চমক প্রথমটায় জবাব দিল না। তারপর বলল, আমরা খবরের কাগজে পড়েছি। কী ভয় যে হয়েছিল তোমার জন্য।

আমি ভাবতাম বোধহয় খবরটা এতদূরে আসেনি।

আসবে না কেন? খবরের কাগজ তো সব জায়গায় যায়। লোকের মুখে মুখেও কিছু রটেছিল।

কী রটেছিল?

গুণ্ডা বদমাশরা নাকি তোমাকে ভীষণ ভয় খায়, ভয়ে কাঁপে।

আমাকে রবীনহুড বানিয়েছে নাকি ?

গাঁয়ের মানুষকে তো জানো। কথা পেলে সেটাকে ফেনিয়েই যাবে। কথা ছাড়া গাঁয়ের মানুষ থাকতে পারে না। আমার বরটিকে তো দেখি, সারাদিন এর ওর তার সঙ্গে উঠতে বসতে কেবল বক বক আর বক বক। শহরের লোকেরা যেমন মেপে কথা কয়, এখানে তো তা নয়।

যীশু মাথা নিচু করে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, বউ আর আসবে না রে চমক। বড় খারাপ সময় যাচ্ছে আমার।

কী যে বলো না। মেয়েমানুষের আবার অত তেজ কী ? তোমার মতো পুরুষকে সে কি জানে না ? ওই চোখের দিকে চাইলে তো কাপড় ভিজে যাওয়ার কথা।

যীশুর কানে আঙুল দিতে ইচ্ছে করল, তোরা বড্ড ঠোঁটকাটা, অসভ্য।

হি হি করে নির্লজ্জের মতো হাসল চমক, সত্যি বলছি গো। বেশি লাই দিয়েছো বলে মাথায় চড়েছে। আমাদের সব ম্যান্দামারা পান্তাভাতের মতো বর, তাদেরই হাঁকে ডাকে আমরা অস্থির। ওই যে তোমার পরেশদাদা, হেঁদেল কুতকুত, তার দাপট তো দেখ না। বাইরে সবাই কেঁচো, ঘরে এলে বাঘ।

তোর কর্তা কেমন ?

খুব হাসল চমক, ওই যা বললাম ম্যান্দামারা পান্তাভাত। তার সামনেও বলি। তোমার বউয়ের গল্প করবে যীশুদা ?

কোনো গল্প নেই রে। আমি বেশি গুছিয়ে বলতেও পারি না।

সে নাকি ভয় পেত তোমাকে। বরকে আবার ভয় কিসের বুঝি না বাবা।

যীশু হঠাৎ বলল, তুই কি আজকাল মুখরা হয়েছিস চমক ?

চমক ফের হাসল। বলল, হবো না ! আগে মুখ ছিল না, এখন সব দেখেশুনে হয়েছে। মুখের জোরেই বেঁচে আছি।

তোর বর তোকে ভয় খায় ?

তা খায়।

তোকে সে ভয় খায় কেন ?

চমক অবাক হয়ে বলল, খাবে না ? সেটাই তো নিয়ম।

আবার এই যে বললি, বরেরা বাড়ি এলে বাঘ হয়।

চমক হেসে বলল, তাও হয়। বাঘ হয় বললে ভুল হবে. বাঘ সাজে। বউরূপীর মতো। আমরা তো বরের মধ্যে একটু বাঘ-বাঘ গন্ধ পছন্দ করি, তাই হাঁক ডাক একটু করতে দিই। বেশি বাড়াবাড়ি করলে অবশ্য মুখ ছোটাই। সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা। এসব সাইকোলজি তুমি বুঝবে না।

বেশ কথা বলতে শিখেছিস।

আমাদের শিখতে হয় না। কিন্তু এ তো কেবল আমার কথা হচ্ছে। তোমার কথা বলো।

আমার গল্প তোদের মতো নয় চমক।

তুমিও যে আর সকলের মতো নও। তোমার গল্প তো আলাদাই হবে।

আমি কেমন?

অন্যরকম।

যীশু হাসল। মাথা নেড়ে বলল, সবাই বলে। কিন্তু আমিই ঠিক বুঝতে পারি না আমি কিরকম।

বলব?

বল না।

তোমাকে দেখলে একটু ভয়-ভয় করে, আবার ভালও লাগে। মেয়েমানুষ যেমনটা চায় আর কী। তোমার বউটা খুব বোকা।

যীশু কিছু বলল না। কিন্তু তার স্মৃতি আলোড়িত হল। কমল কি এরকমই একটা কিছু বলেনি তাকে?

বলেছিল। থানায় এল সামুকে সনাক্ত করতে। লক আপ-এ নিয়ে গেল যীশু নিজে। ধুলোমলিন মেঝের ওপর শুয়ে তখন ঘুমোচ্ছে সামু পেরেরা। গালে দাড়ি, মাথায় অনেক চুল ঘাড় অবধি নেমে গেছে।

অনেকক্ষণ ধরে দেখল তাকে কমল। তারপর বলল, এই সে।

তারপর ঘরে এসে যীশুর মুখোমুখি স্তব্ধ হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ।

আপনি ওকে ধরতে সাহস পেলেন?

সাহসের কী দেখলেন? এই তো আমাদের রোজকার কাজ।

লোকটাকে দেখলেই তো ভয় করে।

আমার করে না।

আপনাকে দেখলেও যে করে।

আমাকে! আমার মধ্যে ভয়ের কী আছে?

শুধু ভয় নয়, আরো কিছু হয়।

কী হয়?

সব কি বলতে আছে? শুধু মিনতি করছি, লোকটা যেন ছাড়া না পায় দেখবেন।

কথা দিতে পারছি না। মামলায় আমাদের হাত সামান্যই।

কমলের চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়ছিল। কাঁদতেও জানে বটে

মেয়েটা। যীশুর ইচ্ছে করছিল, রুমাল দিয়ে চোখ মুছে দেয়।

॥ চার ॥

দুঘণ্টা রোদে আর জলে ঠায় ধরনা দিয়ে থাকার পর অবশেষে মন্ত্রী দোতলার বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। মাইক বা ওয়াকি টকি নেই। নিচে দু আড়াইশো লোক হৈ-হৈ করে উঠল। মন্ত্রী দুহাত তুলে তাদের চুপ করালেন।

"ভাই সব, আপনাদের স্মারকলিপি আমি পেয়েছি। সমাজসেবী সামু পেরেরার হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী পুলিশ অফিসারের সাজা হবেই। বিচার বিভাগীয় তদন্তের কথাও আমরা ভেবে দেখব। তবে আপাতত ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারি চলছে। রিপোর্ট এখনো আমার হাতে আসেনি। আমি পুলিশকে তাড়াতাড়ি রিপোর্ট দিতে বলেছি। এস আই বিশ্বাসকে জেরাও করা হয়েছে দুবার। কেস কোর্টে যাবে। ইতিমধ্যে আপনারা ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন করুন। জানকী দেবীর সঙ্গে আমার কথাও হয়েছে। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, এস আই বিশ্বাসের পক্ষে কোনো পলিটিক্যাল প্রেসার আসবে না। তদন্ত নিরপেক্ষ হবে। অ্যাসেম্বলিতেও আমরা কথাটা তুলব...."

খুব হাততালি পড়ল। আর তৃতীয়বার বৃষ্টি নামল।

মন্ত্রী নমস্কার করে ঘরে চলে গেলেন। ভিড়টা ছত্রভঙ্গ হতে লাগল।

ঝুপড়ির দু আড়াইশো লোক আজ বিকেলে তারকেশ্বর রওনা হবে। সকাল থেকে মাইক বাজছে। গঙ্গাজল তুলতে হবে। তারপর ব্যান্ড পার্টির সঙ্গে বাঁকুয়া ঘাড়ে করে রওনা। হাওড়া অবধি ব্যান্ড পার্টি যাবে, তারপর শুধু "ভোলেবাবা পার করেগা...."

ছত্রভঙ্গ লোকজন যে যার মতো বাসে উঠে পড়তে গেল। তাড়া নেই শুধু জানকী আর সুধীরের। তারা ধীরে সুস্থে বেরিয়ে এল রাস্তায়। তারা তারকেশ্বর যাবে না।

আজ কি তোর উপোস জানকী?

হ্যাঁ। সন্তোষী মা। আজ শুক্রবার।

তাই তো।

তোর খিদে পেয়ে থাকলে খা না। আমি দাঁড়াচ্ছি।

সুধীর মাথা নেড়ে বলল, দরকার নেই। চল। মিনিবাসে উঠে বাড়ি।

জানকী আর চাপাচাপি করল না। মিনিবাসে উঠে পড়ল। অফিসের উল্টোদিক বলে ভিড় নেই বাসে। দুজনেই বসবার জায়গা পেল।

ভাড়াটা আমি দেবো।

জানকী একবার সুধীরের দিকে তাকাল। কিছু বলল না। কী চোখ। বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়। সুধীর চোখ ঘুরিয়ে নিল। জানকীর দিকে এখনো সে ঠিকমতো তাকাতে পারে না। ঝুপড়িতে জানকীর ঘরে এখন সামুর বিশাল বাঁধানো ফটো। তাতে মালা। সামনে ধূপ জ্বালা হয়। এখনো সামু অনেকটাই রয়ে গেছে। এখনো সামু ঠিকঠিক মরেনি। আরো কিছুদিন সামু থাকবে, যেমন সব মানুষই মরার পর কিছুদিন থেকে যায়।

টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ মেঘলা। আবার মেঘ কেটে মাঝে মাঝে রোদ উঠছে। এখন দুনিয়াটার কিছু ঠিক নেই। পাগলা ভাব।

সুধীর ভাড়া দিল।

জানকীর কাঁচের চুড়ির ঠিনঠিন শব্দ হচ্ছে। ব্যাগ থেকে একটা ফোল্ডিং পাখা বের করে হাওয়া খাচ্ছে জানকী। বড্ড গরম। উপোস থাকলে গরম বেশি লাগে। পাখাটা জাপানী এবং দামী জিনিসে তৈরি। সামুর ঘরে যে রেডিও বাজে সেটাও হল্যান্ডের।

জানকী, নাম। এসে গেছি।

জানকী চোখ বুজে ছিল। চাইল। কী চোখ! জানকী তার ওপর হালকা করে কাজল পরে।

উঠল। ধীর দুলকি চালে নামল।

সুধীর!

বল।

লাইন দিয়ে চল। রাস্তা কম হবে।

সুধীর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, চল।

বাজারের পথে থিক থিক করছে কাদা। পচা আবর্জনার গন্ধ বৃষ্টিতে ঘুলিয়ে উঠছে। সাইকেল সারাইয়ের দোকানের পাশ দিয়ে লেভেল ক্রসিং এড়িয়ে তারা লাইনে উঠে এল। হাওয়াই চটির ছিটকে ওঠা জলে জানকীর জয়পুরী শাড়ি কোমর অবধি বিচিত্তির হয়েছে, পিছন থেকে দেখল সুধীর।

ভেজা পিছল সরু লাইনের ওপর পা ফেলে জানকী কি করে এত অনায়াসে হাঁটে সুধীর ভেবে পায় না। তার ওপর পায়ে হাওয়াই চটি, এক নম্বরের বিশ্বাসঘাতক জিনিস।

তুই নাচতি, না জানকী? তাই অত ব্যালান্স।

শুধু নাচতাম! প্লেট ড্যান্স জানিস?

না, কী সেটা?

থালার ওপর নাচ।

জানকী অনেকক্ষণ বাদে হাসল। আর এই হাসিকুটুরই প্রতীক্ষা ছিল সুধীরের। আজ সকাল থেকে জানকী হাসেনি।

মন্ত্রী কী বলল তোকে?

অনেক ভাল ভাল কথা। দরখাস্তটা হাতে নিল, পড়ল। তারপর?

ওই যা বলে। ব্যবস্থা হবে। জুডিসিয়াল এনকোয়ারির কথায় মাথা পাতল না।

বিশ্বাস এখন কি হাজতে?

না না। হাজতে নেবে এত সোজা?

পালিয়েছে?

সে পালানোর লোক নয়।

সুধীর শ্লিপারের ওপর হাঁটছিল। কাঠের শ্লিপারের পর লোহার সরু শ্লিপার এসে যেতেই পাশে কাঁচা রাস্তায় নেমে পড়ল। রাস্তাটা দুর্দান্ত পিছল।

সুধীর!

বল?

তুই কি আমাকে কিছু বলতে চাস?

কী বলব?

জিজ্ঞেস করছি তো। কিছু বলতে চাস?

ভাবছি।

বলতে হলে অন্য দিন বলিস। আজ আমার উপোস। শুক্রবার।

ধুর! তুইও যেমন।

তোর চোখ দেখে মনে হয়, কিছু যেন কথা আছে তোর বুকের মধ্যে।

লাইনের ওপর কী চমৎকার ভারসাম্য রেখে রাজহংসীর মতো হাঁটছে জানকী! সুধীর একটু পিছিয়ে থেকে দেখল।

বাড়ি যা সুধীর। স্নান কর, খা। তোর খিদে পেয়েছে।

যাবো। আজ তারকেশ্বর যাওয়া হল না। গেলে আমারও তা উপোসই ছিল।

গেলি না কেন?

ঝুপড়ি ফাঁকা হয়ে যাবে। সবাই যাচ্ছে।

জানকী হাসল, তাতে কী হত? ডাকাত পড়ত?

তা নয়। ঝুপড়ি তুলতে পুলিশ টুলিশ যদি আসে, কেউ কথা বলার নেই। এই নিয়ে তিনবার নোটিশ হল।

তুই বোকা। ঝুপড়ি তোলা অত সহজ নয়। কত ভোট জানিস?

জানি। তবু ভরসা হয় না।

তুই না সামুর জায়গা নিবি সুধীর? এই তোর মুরোদ!

মুরোদের কী দেখলি?

দেখলুম, তোর মুরোদ নেই। সামু কী করেছিল জানিস?

কী?

হবিগঞ্জের মেলা থেকে স্রেফ তুলে এনেছিল আমাকে। একবারও জিজ্ঞেস করেনি ওকে আমার পছন্দ কিনা।

ওঃ, সেটাই মুরোদ?

মুরোদ নয়?

সুধীর চুপ করে গেল। ঝুপড়ির পর ঝুপড়ি, সার সার, অশেষ। লোকজন উঁকি দিয়ে দেখছে জানকীকে।

ফাটা একটা শব্দ হচ্ছে লাউড স্পীকারে। আজ সারাদিন ধর্মের গান হওয়ার কথা। কে যেন এখন গরম হিন্দী গান লাগিয়ে দিয়েছে।

জানকী, গাড়ি আসছে।

দেখেছি।

লাইনে দশ বারোটা বাচ্চা খেলছিল। কুঁচোকাঁচাও আছে। একজন মেয়েছেলে বাসন মাজছিল। আর অনেকেই বসে-টসে আছে লাইন জুড়ে, কদাচিৎ কেউ চাপা পড়ে। সময় মতো সবাই সরে যায়। দিন রাতে বারবার। বাসনমাজা মেয়েছেলেটা সরল বটে, কিন্তু একটা বাটি ফেলে এসেছে বলে ফিরে গেল। হাত বাড়িয়ে নিচু হয়ে বাটিটা যখন টেনে নিল, তখনও মনে হচ্ছিল, ওর হাতটা গেছে চাকার তলায়। তীরবেগে গাড়িটা বেরিয়ে গেল। একটা টানা বাঁশির শব্দ করে।

জানকী নেমে পড়েছিল, আবার লাইনে উঠল।

ঝুপড়ির মাঝ বরাবর মন্দির। একটা টালির ঘর, খোলামেলা। শীতলা, কালী, শিব, শনি সব আছে। মেইন লাইন থেকে বে-আইনী তার টেনে মন্দিরে ইলেকট্রিক কানেকশন নেওয়া হয়েছে। ঝুপড়িতে আর ইলেকট্রিক আছে সামুর ঘরে। আর কোনো ঘরে ইলেকট্রিক নেই।

মন্দিরে একটা বিরাট জটলা। বিস্তর বাঁক আর মেটে কলসী জড়ো হয়েছে। মন্দিরের মাথায় দুটো লাউড স্পিকার। আরও দুটো কিছু দূরে দূরে।

জানকী মন্দিরের সামনে দাঁড়াল। বেশ বড় ঘর। চাটাই পাতা। উপোস করে পড়ে আছে অন্তত পঞ্চাশ জন। জানকীকে দেখে দুচারজন উঠল।

যতীন বলল, হল রে জানকী?

কী আর হবে ?

মন্ত্রী নাকি কথা বলেছে তোর সঙ্গে।

তা বলবে না কেন ? কথাই তো কেবল হচ্ছে।

তখনই বলেছিলাম ফুঁড়ে দে। একটা মরদেরও সাহস হল না, আর সামুও কেন যে নেতিয়ে গেল।

সামু তো আর তোমার মতো গাড়ল নয় যতীনদা। যীশুকে ফুঁড়ে দেবে অত সহজ ? সে পাল্টা গুলি চালাত না ? তার সঙ্গে ফোর্স ছিল না ? কজন মরত তা জানো ?

বেঁচেই কি আছি নাকি ? যা, ঘরে যা। জিরো গিয়ে। ক'দিন যা ধকল যাচ্ছে তোর।

বেচু আর তার বউ অশ্রাব্য ভাষায় ঝগড়া করছে সেই সকাল থেকে। এখনো থামেনি। তাদের ঘরের সামনে মেলা লোক জুটেছে। মজা দেখছে দাঁড়িয়ে।

জানকী সেখানেও একটু দাঁড়াল। পারেও এরা। ঘরের বাইরে ভাতের হাঁড়ি আর অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্ত ছয় ছত্রখান। বেচু রাগ দেখিয়েছে। বউটার চুল ছেঁড়া, গালে মারের দাগ। চেঁচাতে চেঁচাতে গলা বসে গেছে। বেচু উবু হয়ে বসে বিড়ি ফুঁকছে আর বউয়ের ঘাড়ে আবার লাফিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হচ্ছে।

জানকীকে বেচু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল।

জানকী শুধু বলল, আজ কাজে গেলি না তাহলে ?

বেচু দাঁত বের করে হাসল, আজ এই মাগীকে রেলের তলায় ফেলব। তারপর অন্য কাজ।

সামু কখনো এসব ঝগড়া-কাজিয়া থামাতে আসত না। ইচ্ছে করলেই থামাতে পারত। একবার রক্ত জল করা গলায় একখানা ধমক দিলেই সব চুপ মেরে যেত। কিন্তু সামু সেটা কখনো করত না। বলত, ওদের এটাই এন্টারটেনমেন্ট। ঝগড়া না করলে চাঙ্গা হয় না। আলুনি লাগে।

আয় সুধীর। বলে জানকী উদাসীন পায়ে নিজের ঘরের দিকে এগোলো।

এখনো লোকে কিছু মানে জানকীকে। সামু সবে মরেছে, এখনো তার স্মৃতি আর তার ভয় থাবা গেড়ে আছে মানুষের মনের মধ্যে। ভালবাসাও। তবে এটা থাকবে না। জানকী ক্রমে খুব সাধারণ ঝুপড়িবাসী হয়ে যাবে নাকি ?

সামু আর জানকীর ঘরটা একটু তফাতে। একটু অন্যরকম। কোমর সমান ইঁটের দেয়াল, তার ওপর মজবুত বেড়া। টালির ছাউনিটাও বেশ ভাল। জলটল পড়ে না। মেঝেটা হালকা সিমেন্টের প্রলেপ দেওয়া। দরজাটা আবজানো ছিল। তালা দেওয়ার তেমন দরকার পড়ে না। সবাই নজর রাখে।

সামুর বাঁধানো ফটোটা কাঠের টেবিলের ওপর জ্যান্ত সামুর মতোই অবস্থান করছে। গালে দাড়ি, লম্বা ঘাড় অবধি চুল। চোখ দুখানা যেন ফাটার ভিতর থেকে সুধীরের বুকের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। টাটকা একটা জবা ফুলের মালা ফটোয় পরানো। সামনে ধূপদানিতে পুড়ে যাওয়া ধূপকাঠি।

বিছানায় একটা ঝকঝকে জাপানী টু ইন ওয়ান পড়ে আছে অবহেলায়।

কেরোসিনের স্টোভটা ধরিয়ে চায়ের জল বসাল জানকী। তারপর সুধীরের দিকে তাকাল।

পারবি সুধীর।

তুই এমন ভাবে মাঝে মাঝে কথা বলিস যে চমকে যাই। কী পারব?

সামু পেরেরার জায়গাটা দখল করতে?

সুধীর মাথা নেড়ে বলল, সন্তোষ আছে, বুড়টা আছে, তারা কি ছাড়বে? জোর একটা লড়াই লাগবে।

আমি চাই তুই হ। পারবি না?

সুধীরের চেহারাটা খারাপ নয়। সে সামুর বংশবদ ছিল। নেপাল আর বাংলাদেশ হয়ে চোরা পথে মাল আমদানির যে মস্ত কারবার ছিল সামুর, তাতে সুধীর ছিল মস্ত সহায়। সব চ্যানেলই সে ভাল চেনে। সীমান্তের পাহারাদারদের সঙ্গে তার গভীর দোস্তি।

তবু সুধীর নরম মানুষ। সে হাল্লা চিল্লা করে না। মারদাঙ্গা কাজিয়ার চেয়ে সে আপসরফায় বেশি বিশ্বাসী।

কুলুঙ্গি থেকে বাঘের মুখওয়ালা লাইটারটা তুলে নিয়ে একটা সিগারেট ধরাল সুধীর। সামুর প্রিয় লাইটার। সিগারেট ধরানোর পরও বার কয়েক লাইটারটা জ্বালাল সে। প্রতিবার এক স্ট্রোকে জ্বলে।

নিবি? নে না। সামুর জিনিসপত্র তুই-ই সব নিয়ে নে। জামা প্যান্ট আছে, দাড়ি কামানোর জিনিস আছে…

ধুর? ওসব আমারও আছে।

বললি না?

কী বলব? ওসব সর্দারি করা আমার পোষায় না।

তুই বড্ড নরম।

যে যার নিজের মতো হওয়াই ভাল। তুই আমাকে সামু বানাতে চাস কেন?

সামুর মতো যে আর কেউ নেই। শুধু একজন…

সে আবার কে?

জানকী মাথা নেড়ে বলল, কেউ না।

চা দুজনে নিঃশব্দে খেল। সামু দুজনের দিকেই চেয়ে আছে। ফটোর ওই মজা। ফটোর চোখ একই সঙ্গে সকলের দিকে চেয়ে থাকতে পারে। সত্যিকারের চোখ পারে না।

জানকী চায়ের কাপ রেখে বাইরে এল। তার মুর্গীগুলো অনেকক্ষণ ছাড়া।

লাইনের ওপাশে পোলোর মতো দেখতে বাঁশের খাঁচা। চট দিয়ে ওপরটা ঢাকা। ভিতরে একটু মাচান করে দেওয়া আছে। মুর্গীর ঘর।

জানকী চুলটা খুলে টাইট করে খোঁপা বেঁধে নিল। কোমরে আঁচলটা জড়িয়ে গুঁজল। ঝোপ-জঙ্গলের আশে পাশে তার কালো আর লাল দুটো মুর্গী ঘুরছে।

জানকী লাইন পেরিয়ে কাছে যেতেই কালোটা বকবক করতে করতে ছুটল। কিন্তু জানকী বাজপাখির মতো গিয়ে পড়ল তার ওপর। ঝটপটানো পাখিটাকে তুলে খাঁচায় ভরে চট দিয়ে ফোকর বন্ধ করল। তারপর ওত পেতে রইল আর একটার জন্য। লাল মুর্গীটা পালিয়ে গিয়েছিল বাসক গাছের নিচে। একটু বাদে সন্তর্পণে বেরিয়ে এল। টক করে তুলে নিল জানকী।

খুব হয়েছে, খানকির বেটি, এখন গিয়ে বসান দে।

দ্বিতীয় খাঁচাটায় তিনটে ডিম পেল জানকী। আজ শুক্রবার বলে ভুল না।

রেল লাইনের ওপাশটায় বসতি নেই। তবে বড় বাইরে করার জন্য কয়েকটা বেড়ায় ঘেরা জায়গা করা আছে। আব্রু সামান্যই। এর বেশি দরকার হয় না।

প্রকাশ্যে রেল লাইনের ধারে বাড়িটা ছড়িয়ে বসে পেচ্ছাপ সেরে নিয়ে জানকী উঠে এল। রেলের ধারে কাদাটে মাঠে কয়েকটা ছেলে ভূত হয়ে ফুটবল পেটাচ্ছে। পচা মাছের গন্ধ ছাড়ছে যেন কোন ঘর থেকে। মেঘ কেটে গিয়ে রোদ ফুটেছে চড়া।

ঘরে টু ইন ওয়ানটা চালিয়েছে সুধীর। বাইরে লাউড স্পিকারের শব্দটা থেমেছে কিছুক্ষণের জন্য। লাইন ধরে কয়েকজন গঙ্গায় জল আনতে রওনা হল। নতুন হাফ প্যান্ট, নতুন গামছা পেঁচিয়ে পরা, গায়ে নতুন গেঞ্জি।

সুধীর বিছানায় আধশোয়া, গান শুনছে।

জানকী ঘরে এসে গামছা আর কাপড় কাঁধে ফেলে বলল, স্নান করে আসি। তুই বাড়ি যাবি না?

যাচ্ছি।

দরজাটা টেনে যাস।

দরজাটা থেকে একবার সুধীরের দিকে ফিরে তাকাল জানকী। না, আজ অবধি সে সুধীরের সঙ্গে শোয়নি। সামুর পর আর কোন্ পুরুষই বা আলুনি নয়? শুধু সুধীরটা একটু ভদ্রলোকের মতো বলে মনে মনে তাকে গ্রহণ করতে

চেয়েছে জানকী। আজও ঠিক পেরে ওঠেনি।

মাঠ পেরিয়ে একটা পুকুর। ভরভরন্ত। তবে জল ঘোলা, নোংরা। ছাই ভাসছে। এক গাদা মেয়েপুরুষ স্নানে নেমেছে।

জানকী জলে নেমে অনেকক্ষণ গা ডুবিয়ে চুপ করে রইল।

যীশু বিশ্বাস শুয়োরের বাচ্চা খানকির ছেলে। যীশু বিশ্বাস বেজন্মা। আঁশবটি দিয়ে তাকে কুচি কুচি করে কাটলেও জানকীর গায়ের জ্বালা জুড়োবে না।

যীশুর কথা মনে হতেই মাথায় রক্তটা চড়াত করে উঠে গেল জানকীর। সে ডুব দিল। আবার আবার।

অনেকক্ষণ স্নান করল জানকী। তারপর উঠে এল।

পটলের বউ ধারে বসে পা ঘষছিল।

কীরে জানকী?

এই তো।

জানকীর কথা কইতে ইচ্ছে হল না। ভেজা মাথাটা শুধু মুছে নিল।

পটলের বউ নানা কথা বকবক করছে। কথার কি শেষ আছে মানুষের? চুল ঝা ঝাড়তে ঝাড়তে আলগা আলগা শুনছিল জানকী। তার মধ্যে একটা কথা কানে খট করে লাগল।

বিজয়বাবু ঘোরাফেরা করছে। সন্তোষের সঙ্গে কথা হয়েছে।

বিজয় মানে? অজয় সাধুর ভাই?

তবে আর কে?

জানকীর গা ফের জ্বালা করল। তবে এরকমই হবে, জানা ছিল। বেইমানির জন্য অজয়কে মেরেছিল সামু। আর তার ভাইয়ের সঙ্গে আশনাই করছে সন্তোষ।

ঘরে এসে জানকী দেখল, সুধীর নেই। কাপড় ছেড়ে সে আর একবার চা করল।

সামুর ছবিটার দিকে বারবার চোখ পড়ছে। কোনো মানে হয় না। একজন মুছে গেছে তো মুছেই গেছে। আর ফিরবে না। তাকে নিয়ে পড়ে থাকলে চলে?

চা খেয়ে বিছানায় একটু গড়াল জানকী।

যীশু বিশ্বাস, তোমার কী হবে?

জানকী চোখ বুজল। তার বাঁ হাতের নখে এখনো একটু শিরশির করে। যীশুর ডান গাল ছিঁড়ে দিয়েছিল সে।

তবু অবাক কাণ্ড, যীশু একটা টুঁ শব্দও করেনি। শক্ত পাথরের মতো দাঁড়িয়ে

ছিল। আর চোখ! বাবাগো! কী চোখ? সামু পেরেরাও বোধহয় ওই চোখে বেশিক্ষণ চোখ রাখতে পারত না।

তখন সামুর লাশ পড়ে আছে লক আপ-এ। পুলিশ পাহারায়। থানায় থমথম করছে আবহাওয়া। তার মধ্যে জানকীর চিৎকার আর মাথা কোটাকুটিতে একটা ভুতুড়ে কাণ্ড যেন ঘটে যাচ্ছিল। শ দুই লোক ঘিরে ফেলেছিল থানা। সামুর লাশ যাতে পাচার হয়ে যেতে না পারে। দুশো ক্ষিপ্ত উন্মত্ত রক্তপাগল লোক। তারা সামুর বন্ধু, সাকরেদ, অনুগামী, সামুর জন্য জান-কবুল। কোনো পুলিশ অফিসারের সাহস ছিল না তাদের মুখোমুখি হয়।

কিন্তু যীশু বিশ্বাস? ওই খানকির ছেলে, শুয়োরের বাচ্চার বুকের পাটা আছে বটে। গম্ভীর পাথুরে মুখে স্বাভাবিক পায়ে হেঁটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল দু'শো লোকের মধ্যে, গিয়ে জীপে উঠে চলে গেল। মরদদের কারো সাহস হল না তার গায়ে হাত তুলতে বা একটা টুঁ শব্দ করতে।

যীশুর পিছন পিছন চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এসেছিল জানকী, মার ওকে, মেরে ফেল শুয়োরের বাচ্চাকে···ছেড়ে দিস না···

কেউ সে কথা শোনেনি।

আর এক খানকি হচ্ছে কমল ঘোষ। থানায় গিয়ে ঘুস ঘুস ফুস ফুস কিছু কম করেনি মাগী।

জানকী উঠল, শরীরটা ঝিমঝিম করছে। সন্তোষী মার পুজোটা সেরে নিয়ে রান্না বসাতে হবে। সকাল থেকে সময় পায়নি।

পুজো করার আর কোনো মানে হয় না। তবু ব্রতটা শেষ অবধি করে যাবে সে। সামু ফিরবে না, কিন্তু যীশু বিশ্বাসকে অন্তত চোদ্দ বছরের মেয়াদে ঘোরাতে পারলে তার শান্তি। আজকাল সে পুজোয় বসে সন্তোষী মার কাছে এসবই প্রার্থনা করে।

একটু ঘি দিয়ে সেদ্ধভাত খেয়ে যখন উঠল জানকী তখন তিনটে বেজে গেছে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। দরজাটা খুলে একটু দাঁড়াল। ডোবা ছাপিয়ে জল এসে গেছে মাঠে। চারদিক সবুজে সবুজ। লাউড স্পিকারে ফাটা আওয়াজ করে "কত দূর আর কত দূর···' গান বাজছে।

যীশু বিশ্বাস কেন শ্মশানে গিয়েছিল তা আজও জানে না জানকী। সামুর দেহটা যখন মর্গ থেকে ছাড়া হল, তখন সেটা কালো হয়ে গেছে। সামুকে চেনাই যাচ্ছে না। আর গন্ধ ছাড়ছিল খুব। ওই দেহ বহন করে আনা হয় ঝুপড়িতে। ফুল ছড়ানো হল, গন্ধ চাপতে অন্তত সাত শিশি অগুরু ঢালা হল, জ্বালানো হল গোছা গোছা ধূপকাঠি। হরিধ্বনি দিয়ে ঝুপড়ি খালি করে অন্তত পাঁচশো লোক

শ্মশানে গিয়েছিল। সে এক দৃশ্য। টেম্পোতে সামু, সামুর সঙ্গে জানকী, সুধীর, সন্তোষ, পটল, বাবলু, আর পিছনে পায়ে হেঁটে বাকিরা। রাস্তায় লোক হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখল। কে যায় রে! কোন ভি আই পি?

ইলেকট্রিক চুল্লিতে যখন লাইন দিয়ে রাখা হল বডি তখন জানকী বেরিয়ে এসেছিল বাইরে।

কে একজন ফিস ফিস করে তার কানে কানে বলল, জানকী। ওই দ্যাখ কে এসেছে!

কে রে?

ওই যে নীল হাওয়াই শার্ট আর প্যান্ট পরা। দেখ না।

জানকী দেখল। চোখ ভরা জল নিয়ে দেখল। নীল হাওয়াই শার্ট পরা লম্বা লোকটা ভিড়ের ভিতর দিয়ে এগিয়ে এল।

প্রথমটায় লোকে হকচকিয়ে গেলেও তারপরই শুরু হয়েছিল গালাগাল। অশ্রাব্য, অশ্লীল। যীশু বিশ্বাস নিশ্চয়ই জীবনে অনেক গালাগাল খেয়েছে। তাই দৃকপাত করল না কোনো দিকে।

বেদীর ওপর শোয়ানো সামুর খাটের কাছে এসে বোধহয় মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইল।

গাটস! কলজের জোর! বুকের পাটা! কী দেখাতে এসেছিল যীশু বিশ্বাস?

কে জানে কী? তবে দেখিয়েছিল কিছু। তারপর আবার মিলিটারি কায়দায় অ্যাবাউট টার্ন হয়ে ফিরে চলে গেল। চারদিকে চেঁচামেচি, গালাগালের ভিতর দিয়ে। একটা চায়ের ভাঁড়ও কে যেন ছুঁড়ে মেরেছিল, লাগেনি।

আজও ভাবলে শিরশির করে জানকীর হাত পা। বুকের মধ্যে যে কেমন একটা করতে থাকে। সামু ছাড়া দ্বিতীয় কাউকে পুরুষ বলে ভাবেনি জানকী। কিন্তু যীশু বিশ্বাস তার হিসেবটা ওলটপালট করে দিল।

আইন যেন একটা বেড়া। আইনের এক ধারে যীশু বিশ্বাস। অন্য ধারে সামু পেরেরা। কেউ কারো চেয়ে কম নয়। কিন্তু জানকী টের পায়, কাঠে কাঠে পড়লে যীশুর পাল্লা একটু ভারী। এ সাহস সামুরও ছিল না। কোমরে পিস্তল নেই, সঙ্গে ফোর্স নেই, একা যীশু কিরকম গটগট করে হেঁটে উঠে আসছিল পাঁচশো রক্তপাগল লোকের ভিতর দিয়ে। ও কি মশা মাছি মনে করে মানুষকে?

কী ভাবছিস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

সুধীর।

জানকী মাথা নেড়ে বলল, কিছু না।

থানায় যাবি না? কাল যে বড়বাবু লোক পাঠিয়েছিল।

গিয়ে কী হবে ? ওরা তো সবাই যীশুর দলে।

তবু যাওয়া ভাল। বুঝবে যে, আমরা নজর রাখছি। সহজে ছাড়ব না।

তবে দাঁড়া, কাপড়টা পাল্টে নিই।

জানকী আর সুধীর যখন রওনা হল, তখন মন্দিরে জমায়েত শুরু হয়ে গেছে। ব্যাণ্ড পার্টি এসে গেছে। তুমুল চেঁচামেচি।

সামু কোনোকালে খ্রীষ্টান ছিল। তারপর ঝুপড়ির লোকজনের সঙ্গে মিশে হিন্দুর মতোই হয়ে গেল। তারকেশ্বরে সেও বাঁক ঘাড়ে করে গেছে কয়েকবার। গোর না দিয়ে তাকে যে দাহ করা হল সেটাও হয়তো বেনিয়ম হয়েছে। কিন্তু জানকীর তাতে ক্ষোভ নেই। মরা শরীরটার আর কি ধর্ম আছে ?

মন্দিরে প্রণাম করে জানকী আর সুধীর গিয়ে রিক্সা ধরল।

খানাখন্দে ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং করে রিক্সা লাফাচ্ছে। বড্ড ঘেঁষাঘেঁষি হচ্ছে দুজনে।

জানকী একটু হেসে বলল, তুই মোটা হয়েছিস।

তুই হয়েছিস।

মোটেই না। বড্ড আঁট হচ্ছে।

সুধীর হাসল। বলল, আঁটই ভাল।

খুব যে রস।

সুধীর জানে, ইচ্ছে করলেই জানকী তাকে সব দিয়ে দেবে। মেয়েটার মধ্যে একটা খাই-খাই ভাব আছে। এ মেয়ে বেশিদিন কারো বিধবা হয়ে থাকার পাত্রী নয়। কিন্তু সুধীরের একটু দ্বিধা আছে। সে জানে, জানকীকে নিয়ে ঘর করলে জানকী তাকে ভেড়া বানিয়ে রাখবে। সামুর ধাত অন্য ছিল। কিন্তু সুধীর বড় সাদামাটা।

জানকী।

বল।

যীশু বিশ্বাস এখন কোথায় জানিস ?

পালিয়ে আছে কোথাও।

ও শালা ভয়ে পালাবে না।

জানকী একটু চুপ করে থেকে বলল, ভয়ে পালিয়েছে বলিনি। তবে গা-ঢাকা দিয়ে আছে।

তাও নয়।

তবে ?

যীশু বিশ্বাসের বউকে নিয়ে একটা ঝামেলা হয়েছে। পরশু থানায় গিয়ে শুনে এসেছি।

কী ঝামেলা ?

অত জানি না। তবে ডিভোর্স হয়ে যেতে পারে।

খুব ভাল। ওর সব কিছু খারাপ হোক।

জানকী, তোকে একটা কথা বলব ?

বল না।

যীশুর ওপর তুই যতটা খাপ্পা হয়ে আছিস ততটা রাগ কি তোর সত্যিই আছে ওর ওপর ?

তার মানে ? কী বলতে চাস তুই ?

যীশু বিশ্বাস খুব খারাপ লোক নয় রে জানকী। ঘুস টুস খেত না। সাহস ছিল। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখিস, সামুও কাজটা ভাল করেনি।

এর জন্যই তোর কিছু হবে না সুধীর। তোর রাগ কেবল জল হয়ে যায়। রাগটাকে যদি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে গনগনে করে না রাখতে পারিস তবে সেঁতিয়ে যাবি। এইজন্য লোকে সন্তোষকে মানে, তোকে মানে না। হঠাৎ যীশু বিশ্বাসের পৌঁ ধরলি কেন ?

আমার মনে হয় জানকী, যীশুর ওপর তোরও রাগ পুষে রাখাটা ঠিক হচ্ছে না। যেদিন অজয় সাধুকে মারতে গেল সামু, আমাকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিল। আমি বললাম, শরীর খারাপ। আসলে কী জানিস ? একটা বিয়ের আসরে ওরকম কাজ করতে আমার ইচ্ছে যায়নি।

সামুকে বারণ করিসনি কেন ?

শুনত আমার কথা ? সামু যা ঠিক করত তাই ঠিক। অজয় সাধুকে অন্য সময়েও মারা যেত। আর মেরেই বা কী লাভ হল ? বিজয় সাধু তো ফের আপস করতে চাইছে।

তুই জানিস সেকথা ?

কে না জানে ? সন্তোষের সঙ্গে কথা চলছে।

আমাকে বলিসনি কেন ?

তুই শোকাতাপা মানুষ, শুনলে মন খারাপ হবে, তাই। বলেই বা কী লাভ ?

জানকী চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, আমি শুনেছি। সন্তোষই তাহলে লীডার হচ্ছে !

হোক গে, তোর তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

জানকী মাথা নেড়ে বলল, সামুর জায়গায় পেটমোটা সন্তোষ ! ভাবা যায় ! তোরাও তো ওর হয়ে কাজ করবি ?

সুধীর মাথা নেড়ে বলল, এখন দল ভাঙবে। গ্রুপ হবে। সন্তোষ তো আর

ঝুপড়ির লোক নয়, স্টেশনের কাছে তার বাড়ি। আমরা তাকে মানি না। তবে শত্রুতাও নেই।

ক্ষমতা তো ওর হাতেই চলে গেল?

তা কী করবি? সন্তোষের পলিটিক্যাল পার্টি আছে। ক্ষমতা অনেক বেশি। যতদিন সামু ছিল, মাথা তোলেনি সন্তোষ। এখন সব পাল্টে গেছে। যাচ্ছে। বিজয় সাধুর সঙ্গে আপসে গেলে ভালই হবে।

জানকী চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ বলল, বিজয় সাধুকে থানায় নিয়ে খুব পেঁদিয়েছিল না?

হ্যাঁ, যীশু বিশ্বাস।

যীশু বিশ্বাস! এ নামটা যতবার ভিতরে উচ্চারণ হয় ততবারই জানকী কেমন যেন শরীরের অনুভূতি টের পায়। এত রাগ তার লোকটার ওপর, এত জ্বালা, তবু কেমন যেন শিরশির করে শরীর।

একটা কথা বলবি সুধীর?

কী বল না।

সামুর সঙ্গে কি যীশুর একটা মিল আছে?

সুধীর একটু ভাবল। তারপর বলল, কি জানি। তবে মনে হয় দুটোরই এলেম ছিল। সামুর একটু বেশি।

জানকী মাথা নেড়ে বলল, না। আমাকে খুশি করতে কথা বানিয়ে বলিস না।

সুধীর চুপ মেরে গেল।

থানায় এসে রিক্সা ছেড়ে দিল সুধীর। খবর নিয়ে এসে বলল, বড়বাবু এখন নেই। বসতে হবে।

থানায় এখন তেমন ভিড়-ভাট্টা নেই। একটা ঘরে কাঠের বেঞ্চে গিয়ে তারা পাশাপাশি বসল।

এ ঘরেই যীশু বসত। ওই টেবিলটার ওপাশে। চেয়ারটা এখন খালি। দু পাশে আর দুজন অফিসার বসা। দুজনেই মুখ চেনা।

একজন মুখ তুলে বলল, কী জানকী, খবর কী?

খবর খারাপ।

কেন খারাপ কী? মিনিস্টারের কাছে গিয়েছিলে শুনলাম।

হ্যাঁ।

কাজ হল?

হবে তো বলল।

তুমি তো এখন ভি আই পি। পেপারে নাম উঠেছে। অ্যাসেম্বলিতেও নাম

উঠবে।

কথাটা কোন সুরে বলা তা ধরতে কষ্ট নেই। ছোটোলোকের বাড় দেখলে ভদ্রলোকেরা খুশি হয় না। তখন ছর্‌রা ছাড়ে। এ হল সেই ছর্‌রা।

জানকী মুখের মতো একটা জবাব দিতে পারত। কিন্তু এখন সে পুলিশকে চটাতে চায় না। আর একজন অফিসার তাকে আড়চোখে দেখছে। জানকী তো দেখার মতোই। তার মুখের চামড়াটাই যা একটু কর্কশ। তাছাড়া জানকীর শরীর চমৎকার। এখনো মুঠোভর কোমর, দুখানা বুক ব্লাউজ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চায়, তেমনি তার একটু পুরু ঠোঁট, আর চোখে বিদ্যুৎ, সর্বাঙ্গে মকমক করছে কাম।

সুধীর একটু ঠেলা দিল কনুই দিয়ে। ওই হচ্ছে যীশু বিশ্বাসের বউ।

কে রে? ওই বাচ্চা মেয়েটা।

হ্যাঁ। দেখতেই বাচ্চা।

একজন বৃদ্ধ মানুষের সঙ্গে মেয়েটা ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে, একজন অফিসার তাড়াতাড়ি উঠে বলল, বসুন বসুন। যীশু আজ বড়বাবুকে ফোন করেছিল।

দুজনে বসল অফিসারের মুখোমুখি, কথা সব শোনা যাচ্ছে।

মেয়েটা বলল, ও কি দেশের বাড়িতেই আছে?

হ্যাঁ।

কবে আসবে?

কিছু ঠিক নেই।

ওর বিরুদ্ধে কেস কি উঠেছে?

আরে না, এখনো এনকোয়ারিই ভাল করে হল না তো কেস। ভিকটিমের ওয়াইফ বসে আছে ওই বেঞ্চে।

মেয়েটা মুখ ফিরিয়ে এক পলক দেখল জানকীকে।

ওরা কী চায়?

আবার কী চাইবে? বোধহয় যীশুর ফাঁসিই চায়। মন্ত্রীর কাছে আজ সব মিছিল করে গিয়েছিল। হাল্লাবিল্লা হচ্ছে। জুডিসিয়াল এনকোয়ারি ডিম্যাণ্ড করা হচ্ছে।

কী হবে তাহলে?

দেখা যাক। আপনিও কি মামলা করবেন?

মেয়েটা মাথা নাড়ল, না তো? কে বলল?

শোনা যাচ্ছে, আপনি ডিভোর্সের মামলা আনছেন।

মেয়েটা চুপ করে রইল।

বুড়ো লোকটা বলল, আপনারা ওর কলিগ, আপনারাও তো বলতে পারেন যীশু ঠিক কেমন ছেলে। আমার মেয়ে তো ভীষণ ভয় পায় ওকে।

অফিসার হাসল, ভয় সবাই পায়। যীশু বিশ্বাস একটু কড়া ধাতের লোক।

আজকাল কাগজে বধূহত্যার এত খবর বেরোয় যে আমরাও চিন্তায় পড়েছি। তার ওপর লক আপে যে ঘটনা ঘটে গেল।

অফিসারটি চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ বলল, যীশুর সময়টা ভাল যাচ্ছে না। একটা খাঁড়া মাথার ওপর ঝুলছে। আপনারা এসময়টা বাদ দিয়ে বরং মামলাটা আনুন।

মেয়েটা হঠাৎ উঠে জানকীর কাছে এসে দাঁড়াল।

দিদি, আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

জানকী চোখ বুজে ছিল। খুলল। মেয়েটা দেখতে বেশ সুন্দর। ভদ্রঘরের ছাপ আছে চেহারায়। জানকীও সুন্দর বটে, কিন্তু চেহারায় মাদকতা থাকলেও এ জিনিসটা নেই। সে ছোটোলোক তা দেখলেই লোকে বুঝতে পারে।

জানকী একটু খেঁকিয়ে উঠল, কী কথা।

সুধীর চাপা গলায় বলল, যা না, বাইরে গিয়ে কথা বলে আয়। মেজাজ করছিস কেন?

জানকী সুধীরের দিকে একবার তাকাল। তারপর উঠল।

বাইরে করিডোরে এসে মেয়েটা বলল, সামু আপনার স্বামী?

তুমি বুঝি যীশু বিশ্বাসের বউ?

হ্যাঁ। আপনারা কি চান বলুন তো? এত গণ্ডগোল কেন করছেন? আমরা যে ঘরের বার হতে পারছি না। সবাই প্রশ্ন করে। কী চান আপনারা?

এই ছোটোখাটো দুবলা মেয়েটার গলায় এত ঝাঁঝ দেখে অবাক মানল জানকী। তেজ তার কিছু কম নয়। উল্টে একটু ঝাড়ল, জানকী, কী চাই জানো না? যীশু বিশ্বাসের ফাঁসি চাই। আর কী চাইবো?

পুলিশ তো মামলা করছেই। আপনারা কেন মিছিল করছেন? কেন চারদিকে পাবলিসিটি করে বেড়াচ্ছেন?

সব কি তোমাকে জিজ্ঞেস করে করতে হবে নাকি খানকির মেয়ে? তোমার নাং যখন সামুকে সেল-এর মধ্যে মেরেছিল তখন তুমি কোথায় ছিলে শালী? আমি যেমন বিধবা হয়েছি তেমনি তোমাকেও করে ছাড়ব।

মেয়েটা এই ভাষার সঙ্গে পরিচিত নয়। অবাক হয়ে চেয়ে রইল। থরথর করে ঠোঁট কাঁপছে। হাতে ধরা রুমালটা পড়ে গেল।

জানকী বলল, আমাদের মুখ ভাল নয়, বেশি চোখ টোখ রাঙিও না।

পুলিশের বউ বলে এখন আর পার পাবে না। যীশু বিশ্বাসের হয়ে গেছে।

জানকী এসে সুধীরের পাশে ফের বসল। মেয়েটা আর ঘরে এল না। বোধহয় করিডোরে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। একটু কাঁদুক। ভদ্রলোকের মেয়েরা একটু ছিঁচকাঁদুনে হয়।

খুব তুড়ে দিয়েছি। চোখ রাঙাচ্ছিল।

সুধীর তার দিকে একবার চাইল। কিছু বলল না। বুড়োটা উঠে চলে গেল বাইরে।

বড়বাবু ডাকল আরও আধঘন্টা পরে।

এই যে জানকী।

বলুন বড়বাবু।

বোসো। চেয়ারেই বোসো। তোমাদেরই এখন দিন।

জানকী আর সুধীর বসল। কথা বলল না। বড়বাবুর চেহারাটা পুলিশের মতো নয়। একটু ভালমানুষ গোছের। মাথায় টাক। সামান্য ভুঁড়ি আছে। একটু আয়েসী আর আহ্লাদী। পুলিশের পোশাকে বেমানান লাগে, ধুতি পাঞ্জাবিতে মানাত ভাল।

জানকীর দিকে চেয়ে বড়বাবু টাকে একটু হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন, এত হাঁক ডাক করে কী লাভ হচ্ছে বলো তো! এভিডেন্স আমাদের হাতে, আমরা যদি তা সাপ্রেস করতে চাই তো তোমাদের মিনিস্টার কী করবে? আজও রাইটার্স থেকে ফোন এসেছিল। মিনিস্টারের সেক্রেটারি জানতে চেয়েছে কেস কদ্দূর। বেশ ঘোরালো ব্যাপার করে তুলেছো বটে।

বড়বাবুর চিমটি কাটা কথা জানকীর সহ্য হচ্ছিল না। পুলিশকে তার এমনিতেও কোনোদিন সহ্য হয় না। তাই বলল, কাকের মাংস কাকে খায় না বড়বাবু। আপনারা যীশু বিশ্বাসকে বাঁচানোর চেষ্টা করবেন এ আর বেশি কথা কী? আমরা শুধু পাঁচজনকে জানান দিয়ে রাখছি যে, আমাদের ওপর অবিচার হচ্ছে।

বড়বাবু মাথা নেড়ে বললেন, ঘোড়ার আগে গাড়ি জুতে দিলেই তো হবে না। আগে অবিচারটা হোক তারপর বলা যাবে অবিচার। এখনো তো ভাল করে তদন্তই হয়নি।

ওটা আর ভাল করে হবেও না বড়বাবু। যীশু বিশ্বাস ছাড়া পেয়ে যাবে, আবার কাজে বহালও হবে।

বড়বাবু তুমি থেকে তুইতে নেমে বললেন, তোর সামু বুঝি গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসীপাতা ছিল? বেশি বড় বড় কথা বলবি তো জুতিয়ে মুখ লম্বা করে দেবো

নষ্ট মেয়েছেলে কোথাকার।

বড়বাবুর মুখটা একটু লাল দেখাচ্ছিল। ভালমানুষি ভাবটা আর নেই। জ্বলজ্বলে চোখে চেয়ে রইলেন জানকীর দিকে।

জানকী টেবিলের তলায় ঠ্যাং দুটো যথাসাধ্য মেলে দিয়ে উদাস ভঙ্গিতে বলল, সামু কেমন লোক ছিল তারও তো বিচার হয়নি। মিথ্যে খুনের কেস চাপিয়ে দিলেই তো হবে না।

ক'টা সাক্ষী চাস ? সামুকে খুন করতে দেখেছে তো এক আধজন নয়। বাড়ি যা জানকী। বেশি হৈ-চৈ করিস না। আমরা যদি কেস না সাজিয়ে দিই তবে মন্ত্রী কী করবে ? আমাদের এগেনস্টে একে ওকে লাগাচ্ছিস, কাজটা কি ভাল হচ্ছে ? ভেবে দেখ গে।

জানকী চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বলল, আসছি বড়বাবু।

ফেরার সময় সুধীর বাজারে নেমে গেল, যা জানকী, আমি ঘুরে আসছি।

জানকী যখন রিক্সা থেকে নামল তখন আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। ঝুপড়ি প্রায় ফাঁকা, লাইন ধরে যেতে যেতে ভারী একা লাগছিল জানকীর। যতদিন সামু বেঁচেছিল ততদিন একরকম ছিল। সামু মরে গিয়ে জানকীর সব প্রভাব প্রতিপত্তি চলে গেল।

ঝুপড়ির দরজাটা ঠেলে ঢুকল জানকী। সুইচের জন্য হাত বাড়াল। তারপরই তার মনে হল, ঘরে সামু।

সামু। চেয়ারে একা অন্ধকারে ঠিক এইভাবেই তো মাঝে মাঝে বসে থাকত সামু। ভাবত। বেশির ভাগ মানুষেরই মাথা নেই বলে ভাবনা-চিন্তা করতে পারে না। সামু তাদের মাথায় বুদ্ধি জোগাত। মস্তিষ্কহীন বহু মানুষের মাথা হয়ে কাজ করতে হত সামুকে। অন্ধকারে চুপ করে ঠিক এইরকম বসে থাকত সে।

জানকী, আলো জ্বালিস না।

হিংস্র গলায় জানকী চেঁচিয়ে উঠল, কে ?

জানকীর মুখে একটা ঠাণ্ডা হাত এসে পড়ল, চুপ।

খানকির ছেলে, শুয়োরের বাচ্চা···

জানকীর মাথাটা টলে গেল একটা থাপ্পড়ে। মাথাটা ঘুরছিল। উবু হয়ে বসে পড়ল মেঝের ওপর।

মেয়েমানুষের গায়ে আমি হাত তুলি না জানকী। আজই প্রথম। চেঁচাস না। আমি তোকে ভয় দেখাতে আসিনি।

কাঁপা গলায় জানকী বলল, কেন এসেছো তাহলে ?

উঠে বিছানায় বোস। সুধীর কোথায় ?

জানকী বিছানায় উঠে বসল। তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। বহুকাল ভয় বলে কোনো বস্তু ছিল না তার, আজ ভয় হল।

জানকী বলল; জানি না।

ঝুপড়ির সব মরদ বুঝি আজ তারকেশ্বর গেছে!

হ্যাঁ। আর সেই সুযোগেই—

না জানকী। মরদরা থাকলেও আমি আসতাম। আমার কিছু হত না।

জানকী সেটা জানে। খুব ভালরকম জানে। জানকী বিছানায় দুটো পা তুলে বসল। তারপর বুক খালি করে হুহু কান্না এল তার। সে কাঁদতে লাগল।

লোকটা অপেক্ষা করল। একটাও কথা বলল না।

জানকী দশ মিনিট কাঁদল। একটানা এক নাগাড়ে। তারপর চোখ মুছল। ফোঁপানিটা তবু বন্ধ হল না। হেঁচকির মতো বুক কাঁপিয়ে পাঁজর ভেঙে বেরিয়ে আসতে লাগল মাঝে মাঝে।

কী চাও যীশু সাহেব ? যদি আমাকেও খুন করতে এসে থাকো তো তাই করে যাও। কেউ আটকাবে না।

যীশু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তোকে মেরে কী লাভ ? মারতে আসিনি। ভয় খাস না।

আমি ভয়ের পার হয়ে গেছি। আর ভয় কিসের ?

মানুষ আমাকে কেন ভয় খায় জানিস ?

আমি কি করে বলব ?

আমিও জানি না। আজকাল তাই নিজেকেই আমি ভয় পাই। আমার মধ্যে কী আছে রে ?

জানকী ডান হাতের রুপোর বালাটা বাঁ হাত দিয়ে ঘোরাল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, সুধীর চলে আসবে যীশু সাহেব। তুমি যাও।

সুধীর। সে এসে কী করবে ?

তোমাকে দেখলে চেঁচামেচি করবে। লোক জোটাবে।

তুই সেটা চাস না ?

না যীশু সাহেব।

কেন চাস না জানকী ?

জানকী চুপ করে রইল।

যীশু একটু হেসে বলল, আমাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্য এত চেষ্টা করছিস? সুধীর লোক ডাকলে তোর ক্ষতি কী ?

তোমার ফাঁসি হবে না যীশু বিশ্বাস। আজ থানায় গিয়েছিলাম। বুঝে এসেছি, পুলিশ তোমাকে আড়াল করছে। কাক তো কাকের মাংস খায় না।

এখন খাবে। তুই যে বড় জল ঘোলা করে দিলি জানকী। চারদিকে আমার বদনাম ছড়ালি। আমার গাঁয়ে পর্যন্ত খবর পৌঁছে গেছে। লোকে দেখতে আসছে আমাকে। যেমন চিড়িয়াখানায় গিয়ে বাঘ দেখে লোকে, তেমনি।

জানকী অন্ধকারেই উঠে গিয়ে দরজার হুড়কো দিল। তারপর বলল, তোমার বউও সেই কথাই বলছিল।

বউ। তাকে তুই পেলি কোথায়?

থানায় এসেছিল। তোমার খোঁজখবর করছিল। আমাকে আড়ালে ডেকে একটু চোখ রাঙিয়েছিল, খুব কড়কে দিয়েছি। বলছিল, তোমার জন্য নাকি তাদের খুব বদনাম হচ্ছে।

যীশু বলল, ও।

তারপর চুপ করে রইল।

যীশু সাহেব।

বল।

তোমার মতো মানুষ যদি মেয়েছেলের বশ হয় তবে বড় আফশোসের কথা। তুমি কি মেয়েছেলের ঢলানিতে ভোলো।

এ কথা কেন?

ওই মাগী তোমাকে ফুসলেছিল। ওই শালী খানকির বেটি তোমার কানে বিষ না ঢাললে সামুকে তুমি মারতে না। বলো, সত্যি কিনা।

যীশুর চেয়ারে একটা শব্দ হল। বোধহয় নড়ে বসল সে।

একটু কাঁদল জানকী। ভেজা গলায় বলল, লক আপ-এ একজন কয়েদীকে মারার মতো খারাপ তো তুমি নও যীশু সাহেব। সামুর যক্ষ্মা ছিল, মাঝে মাঝে পেটে অম্বলের ব্যথা হত, অনিয়ম করত, মদ খেত। আমি তো জানি সামু বেঁচে ছিল মনের জোরে। ওই খানকি কমল ঘোষ যদি তোমার কাছে নাকি-কান্না না কাঁদত তাহলে সামু মরত না।

সব কথা তুই বুঝবি না জানকী। বলে লাভও নেই আর।

বলোই না। জানকীর মাথায় শুধু গোবর নেই যীশু সাহেব। তাকে লোক চরিয়েই খেতে হয়। তুমি সামুর পেট থেকে কথা বের করতে চেয়েছিলে। পারোনি। সামু মুখ খোলেনি। তারপর তুমি মেরেছিলে। শুধু ওই মেয়েছেলেটার কথায়।

যীশু স্থির হয়ে বসে রইল। আবছা অন্ধকারে দুটো ছায়ামূর্তি। মুখোমুখি।

যীশু খুব চাপা গলায় বলল, শুধু তাও নয়।

তাহলে ?

তাহলে যে কী তা যীশুও সঠিক জানে না। সেল-এর মধ্যে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ছিল সামু। গায়ে ময়লা জামা, ময়লা প্যান্ট, চারদিকে ধুলো। দরজা খুলে যখন ভিতরে ঢুকল যীশু, তখন সামু চোখ খুলে তাকাল।

ফের সেই চোখ। সামুর চোখই পাগল করে দিয়েছিল যীশুকে। হলদে ম্লান বাল্‌বের আলোতেও সেই চোখের ধূসর কাঠিন্য লোহার শলার মতো এসে বিঁধল যীশুর চোখে। সামু, না সে নিজেই ? ওই চোখ তো তারই প্রতিচ্ছবি ? ওই চোখকেই তো ভয় পায় তার বউ বকুল ? ওই চোখ দেখেই তো পাগল হয় কমল। ও কি সে নিজেই ?

কয়েক মুহূর্তের পাগলামি পেয়ে বসেছিল যীশুকে। সে জানত সামুকে কথা বলানো যাবে না, কিছুতেই না।

তবু নিয়মমাফিক চেষ্টা করেছিল যীশু।

সামু অনড় বসে রইল।

যীশু টের পাচ্ছিল, রাগের একটা ঘূর্ণি ঝড় তার ভিতরে ধীরে ধীরে পাকিয়ে উঠছে। সমস্ত জ্বালা জমা হচ্ছে চোখে। চোখ দুটোই ফেটে যেতে চাইছে তার।

যীশুর হাতে ধরা সামুর চুল। ধীরে, ধীরে সামুর শরীরটা উঠে আসছিল মেঝে থেকে। তারপর সমানে সমানে দুজনের মুখ। চোখে চোখ।

সামু কাঁপছিল। থরথর করে কাঁপছিল। দুটো অঙ্গারের মতো চোখ মেলে অকপটে সে চেয়েছিল যীশুর দিকে। হঠাৎ সে বিড়বিড় করে বলে উঠেছিল, যীশু বিশ্বাস, তুমি কে ?

তোর বাপ।

ঘুসিটা যখন তুলেছিল যীশু, সামু দুটো হাত তুলেছিল, তারপর সেই আর্ত অসহায় বুকফাটা চিৎকার, তুমি কে ?

ঘুসিটা লাগল। একটা হাতুড়ির মতো লাগল।

মোটে একবারই মেরেছিল যীশু। কিন্তু ক্রিয়াটা হল ডবল। ঘুসি খেয়ে মাথাটা গিয়ে লাগল দেয়ালে। কেমন একটা ফাঁপা শব্দ হয়েছিল যেন। ঢপ্। শব্দটা এত অন্যরকম যে, যীশুর হাত শিথিল হয়ে গেল।

এবকবার হাঁ করল সামু। তারপর শরীরটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে গেল মেঝেয়।

কংকাশন। ইন্টারনাল হেমারেজ। মৃত্যু প্রায় তৎক্ষণাৎ।

তুই বুঝবি না। তুই কিছুতেই বুঝবি না জানকী। আমি বোঝাতেও পারব

না।

চুপ যীশু সাহেব! কেউ আসছে।

রেল রাস্তার নুড়ি পাথরে সামান্য শব্দ হল। তারপর দরজায় কে যেন শব্দ করল।

জানকী! এই জানকী!

জানকী অন্ধকারে দরজাটার দিকে সভয়ে চেয়ে রইল। সুধীর। সুধীরের পেটকোঁচড়ে চেম্বার থাকে। সব সময়ে গুলিভরা।

জানকী চমৎকার একটা হাই তোলার মতো শব্দ করে ঘুম-কাতুরে গলার অভিনয় করে বলল, কে রে?

আমি সুধীর। দরজা খোল।

আমি শুয়ে পড়েছি। তুই আজ যা। শরীরটা ভাল নেই।

তোর ঘরে কে জানকী?

জানকী ঠোঁট কামড়াল। তারপর বলল, মুখে লাথি মারব শালা। ঘরে কে থাকবে রে?

তুই কার সঙ্গে কথা বলছিলি?

তোর বাপের সঙ্গে।

খিস্তি দিচ্ছিস কেন?

খারাপ কথা বললে মুখে খারাপ কথাই আসে।

দরজা খোল, কথা আছে।

বলছি তো, আজ হবে না। শরীর ভাল নেই।

তোকে একটা খবর দেবো।

কী খবর?

বিশ্বাস পার পেয়ে গেল। কালু শুনে এসেছে, বিশ্বাসের এগেনস্টে পুলিশ কিছু পায়নি, সামু নাকি পড়ে গিয়ে স্ট্রোকে মারা গেছে।

জানকী কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, এরকমই তো হওয়ার কথা ছিল।

দরজা খুলছিস না কেন? এত বড় একটা খবর দিলুম।

তোর সঙ্গে কে আছে?

কেউ নেই। কেন?

আজ যা সুধীর। শরীরটা আজ ভীষণ খারাপ। সারাদিন হয়রানি কম তো হয়নি।

যীশু এতক্ষণ পাথরের মতো বসে ছিল। এবার চেয়ারের সামান্য শব্দ করে

সে উঠল। জানকীর কাছাকাছি মুখটা এগিয়ে এনে বলল, দরজাটা খুলে দে।

জানকী আতঙ্কিত গলায় বলল, না।

যীশু ফের বলল, যা বলছি শোন।

বাইরে সুধীর হঠাৎ দরজায় দুটো লাথি মেরে বলল, তোর ঘরে লোক আছে জানকী? দরজা খোল।

জানকী উঠল। যীশুর অন্ধকার মুখের দিকে একবার তাকাল। মরদ বটে! একা সুধীর এর কী করবে? পাঁচশো লোকই পারল না।

হুড়কো খুলে দরজা আড়াল করে দাড়াল জানকী, তোর চেম্বারটা আমার কাছে দে সুধীর।

কেন?

দে, যা বলছি শোন।

ঘর অন্ধকার কেন?

বাতি জ্বেলে কি কেউ শোয়? মাথা ধরেছে। চোখে আলো লাগছিল বলে নিবিয়ে রেখেছি।

সুধীরের হাতে রিভলবারটা ঝুলছে। জানকী হাত বাড়িয়ে বলল, দে।

ঘরে কে আছে আমি জানি।

কি করে জানলি?

বুড়টা দেখেছে। যীশু বিশ্বাসকে। শুনে আমার বিশ্বাস হয়নি।

সুধীর, চেঁচামেচি করিস না। করে লাভ নেই। আজ বাড়ি যা।

সুধীর একটু ইতস্তত করল। তারপর বলল, যাচ্ছি। কিন্তু তোর যদি কিছু হয়?

ভয় নেই। যীশু বিশ্বাস মেয়েমানুষকে মারে না।

সুধীর রিভলবারটা পেটকোঁচড়ে গুঁজে ওপরে হাওয়াই শার্ট ঝুলিয়ে দিল। তারপর জানকীর দিকে চেয়ে চাপা গলায় বলল, খানকি!

বলেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

দরজায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল জানকী। তারপর দরজায় ফের হুড়কো দিয়ে বলল, বাতি জ্বালাবো?

জ্বালা।

জানকী সুইচ টিপল, দু-তিনবার জ্বলে নিবে টিউবলাইটটা ঝড়াক করে জ্বলে উঠতেই ঘরটা ঝলমল করে উঠল। ঝুপড়ির ঘরটাও বেশ পয়সা খরচ করে সাজিয়েছিল সামু। খাট আছে, টেবিল চেয়ার আছে, স্টিলের আলমারি আছে, ভাল আয়নার একটা ড্রেসিং টেবিলও আছে।

আলোয় যীশুর দিকে সম্মোহিতের মতো কিছুক্ষণ চেয়ে রইল জানকী। একটু উড়োখুড়ো চুল, দাড়ি কামায়নি ক'দিন, জামা প্যান্টও যথেষ্ট পরিষ্কার নয়। চওড়া হাড় আর শিরা বের করা চেহারায় তবু এক বন্য বাঘের মতো কিছু আছে। আর চোখ। একটু শিউরে নিজের চোখ বুজে ফেলল জানকী। গা শিরশির করে।

শুনলে তো যীশু সাহেব। বেঁচে গেলে। পুলিশ তোমাকে রেহাই দিল।

যীশু স্তিমিত গলায় বলল, তাই নাকি?

নিজের কানেই তো শুনলে, সুধীর বলে গেল। আমার এত ছোটাছুটি বৃথা গেল। আজ সকালেও মন্ত্রী বলেছিল, ব্যবস্থা হবে। হল না।

রেহাই পাওয়া যদি অত সহজ হত!

হল তো!

তুই বুঝবি না জানকী। ও রেহাই পেলেই কী, না পেলেই কী। চাকরি যেত, কয়েক বছর জেল হতে পারত। আর কী হত?

তবে তুমি কিসের রেহাই চাও?

যীশু মাথা নাড়ল, তুই বুঝবি না। বলে লাভ নেই।

তখন থেকে একটা কথাই বলছ। তুই বুঝবি না, তুই বুঝবি না। বলেই দেখ না বুঝি কি-না।

বুঝিস? বলে যীশু হাসল।

বুঝি যীশু সাহেব।

যীশু মাথা নেড়ে বলল, কিছুই বুঝবি না জানকী। আজ সকালেও তুই আমাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্য মিছিল নিয়ে মন্ত্রীর কাছে গেছিস। আর এই যে তোর ঘরে আমি হাতের নাগালে বসে আছি, তুই কিছুই করতে পারছিস না। কেন পারছিস না তা বুঝিস জানকী?

জানকী মাথা নিচু করে রইল। তারপর বলল, তুমি আমার ঘরে এসেছো যীশু সাহেব। অতিথি। অতিথিকে—

যীশু হাত তুলে বলল, থাম। বাজে কথা বলিস না। তুই জানিস যে কথাটা সত্যি নয়।

জানকী একটু হেসে বলে, আর একটা কথাও মনে পড়ল যে : তুমি সামুর জন্য শ্মশানে গিয়েছিলে।

যীশু মাথা নাড়ল, তার জন্যও নয়।

তাহলে কেন?

সেইটেই তো তোকে জিজ্ঞেস করছি। বল তো।

জানকী হাঁটুতে মুখ গুঁজে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর যখন মুখ তুলল, তখন চোখ সজল। মুখখানা লাল।

যীশু সাহেব, তুমি ঠিকই বলেছো। আমার অত বুদ্ধি নেই। তবে এটা জানি, তোমার ফাঁসি হলে আমি সকলের সঙ্গে আবির নিয়ে হোলি খেলতাম। আর রাত্রিবেলা একা ঘরে কেঁদে বালিশ ভিজিয়ে ফেলতাম।

যীশু জানকীর দিকে অকপটে চেয়েছিল। কী বুঝল সে-ই জানে। কিন্তু কথাটাকে গভীরভাবে নিল না। যেন সে জানে, দুনিয়ার সব মেয়েমানুষই কিছু অদ্ভুত। তাদের মাথার ঠিক নেই। কখন কী বলে, কী করে, আর তা কেন করে তা কে বুঝিয়ে দেবে তাকে।

যীশু খুব উদাস গলায় বলল, একটা ঘটনার কথা কেউ জানে না। সামুকে যখন আমি মারি তার আগে সে চিৎকার করে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, যীশু বিশ্বাস, তুমি কে? প্রশ্নটার অর্থ হয় না। আমি যীশু বিশ্বাস, কলকাতা পুলিশের একজন এস আই। আমাকে তো সামু ভালই চিনত। তবে ও প্রশ্ন করল কেন রে জানকী? তুই জানিস?

জানকী মাথা নাড়ল, জানি না।

সেই থেকে আমার ভিতরে গণ্ডগোল হচ্ছে। সামু ও-কথা জিজ্ঞেস করল কেন? জানকী? ওর ড্রাগের নেশা ছিল না তো?

হেরোইন টেরোইন? না, ওসব ছুঁত না। দু একবার বেচেছে। তবে নিজে শুধু মদ খেত। মাঝে মাঝে গাঁজা।

ঠিক জানিস?

আমি জানবো না তো কে জানবে?

মাথায় কোনো গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল ইদানীং?

সামুর মাথায় গণ্ডগোল! কী যে বলো। শরীরটা সেরে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মাথাটা একমাত্র ঠিক ছিল।

যীশু কথা বলল না। তাকিয়ে তাকিয়ে জানকীর ঘর দেখতে লাগল।

চা খাবে যীশুবাবু? করবো?

না। আজ উঠি।

আমি চা খাবো। নিজের জন্যই করছি। তুমিও খেতে পারো। বিষ মিশিয়ে দেবো না।

যীশু একটু হাসল, তোকে বিশ্বাস কী? সামু গেছে এই তো সেদিন, অমনি সুধীরের সঙ্গে লটর-পটর করছিস।

মরা মানুষকে আগলে থাকলে আমাদের চলে? আমরা তত ভদ্রলোক নই।

তবে সুধীর নয়। সুধীরটা একটা মেড়া।

তাই দেখলাম। অন্য কেউ হলে হয়তো গুলি চালিয়ে দিত। ও দিল না।

জানকী খুব হাসল, জীবনে সুধীর বোধহয় মুর্গীও মারেনি। তার ওপর তুমি। তোমাকে মারার সাহস ওর সাত বার মরে জন্মালেও হবে না। চলো, আমি তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

যীশু অবাক হয়ে বলল, আমাকে এগিয়ে দিবি? সে কী রে? শেষ অবধি আমার মেয়েমানুষ পাহারাদারেরও দরকার হল নাকি? এর চেয়ে যে মরা ভাল।

শোনা যীশুবাবু সুধীর মেড়া বটে, কিন্তু কারোই তো মাথার ঠিক নেই। অন্ধকারে তোমাকে একা দেখে পিছন থেকে যদি গুলিটুলি চালায়! আমি সঙ্গে থাকলে চালাবে না।

যীশু মাথা নাড়ল, দরকার নেই। পাঁচজনের চোখে তুই ছোটো হয়ে যাবি। ঝুপড়ির মেয়েমানুষেরা ঠিকই দেখতে পাবে যে, তুই আমার সঙ্গে জুটেছিস।

তাহলে টর্চটা ধরি! তোমার সঙ্গে তো বাতি নেই।

লাগে না।

দরজা খুলে চারদিকে জোরালো টর্চের আলো ফেলল জানকী। তারপর বলল, যাও যীশুবাবু।

জানকী দাঁড়িয়ে রইল। যতক্ষণ অন্ধকারে দেখা গেল, দেখল। লম্বা একটা ছায়া-মানুষ মাথা উঁচুতে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে লাইন বরাবর। দ্রুত পা। উঁচুনিচু জমিতে টক্কর খাচ্ছে না। ঠিক চলে যাচ্ছে।

ও কি অন্ধকারে দেখতে পায়? পায় বোধহয়। সামুও পেত।

ঝুপড়ির দরজা বন্ধ করে যখন বিছানায় বসল জানকী তখন দু ধারে চোখ দিয়ে জল পড়ছে তার। বুকটা এমন চমকে গেছে যে, আজ রাতে তার ঘুম হবে না। আজ বহুদিন বাদে পাশে একজন পুরুষ মানুষের অভাব বড় টের পেল জানকী। আর খুব কাঁদল। কখনো জয়ের আনন্দে, কখনো পরাজয়ের গ্লানিতে। কিছুতেই স্থির করতে পারল না, কেন কাঁদছে।

॥ পাঁচ ॥

পনেরো দিন বাদে আজ যীশু কলকাতার বাসার দরজার তালা খুলল।

শব্দ হয়ে থাকবে। বাড়িওয়ালা দোতলার সিঁড়ির রেলিং থেকে ঝুঁকে তাকে দেখলেন, ওঃ আপনি!

যীশু জবাব দিল না।

বাড়িওয়ালা কয়েকধাপ নিচে নেমে এলেন। তারপর যেন নাগালের বাইরে

থাকাই নিরাপদ বিবেচনা করে মাঝসিঁড়িতে থেমে বললেন, একটু আগে আপনার স্ত্রীও এসেছিলেন। কী সব নিয়ে টিয়ে গেলেন।

ওর জিনিস ও নিতেই পারে।

যীশুর বগলে একটা পুরো পাউন্ড পাঁউরুটি আর এক ভাঁড় মাংস। রাতে খাবে।

ঘরে ঢুকে যীশু আলো জ্বালল। তার এই একটাই ঘর। একটু ঘেরা বারান্দামতো আছে, তাতে রান্নার ব্যবস্থা। সিঁড়ির নিচে কলঘর। এখনো যীশুর বেশির ভাগ জিনিসই এখানে রয়ে গেছে।

যীশু ঘেমো জামাপ্যান্ট ছেড়ে খালি গায়ে ফ্যানের নিচে একটু বসে রইল। তারপর কলঘরে গিয়ে কল ছেড়ে দেখল, জল নেই।

বাইরে মুখ বের করে যীশু একটা হাঁক দিল, রতনবাবু!

দোতলায় বোধহয় টি ভি-টার শব্দ সঙ্গে সঙ্গে কমে গেল।

কিছু বলছেন!

কলে জল আসছে না কেন?

আসছে না? দাঁড়ান, স্টপ কলটা বোধহয় কেউ বন্ধ করে রেখেছে। কে যে এসব করে! দাঁড়ান খুলে দিয়ে আসছি।

একটু বাদেই কলে হিসস্ শব্দ। তারপর মোটা নালে জল এল। সাবান মেখে অনেকক্ষণ ইচ্ছেমতো স্নান করল যীশু।

ঘরে এসে ফের পাখার তলায় বসল। বকুল এসেছিল। তার অবশ্য কোনো চিহ্ন নেই। হয়তো শাড়িটাড়ি দরকার ছিল। কিন্তু কেন যে ওর সব জিনিসই এখনো নিয়ে যায়নি!

যীশু চুপচাপ বসে ভাববার চেষ্টা করল। মাথা সে অকাজে কখনো ব্যবহার করে না। বেশির ভাগ সময়েই তার মাথা চিন্তাশূন্য থাকে। আজ চিন্তা আসছে।

একটা চওড়া চৌকি, একটা আলনা, খান দুই লোহার চেয়ার ছাড়া তার ঘরে আর কোনো আসবাব নেই। চৌকির নিচে দুটো তোরঙ্গ। কিছু গড়ে তোলার অবকাশ পায়নি যীশু। দু-দুটো বোনের বিয়ে দিতে গিয়ে সে ফতুর হয়েছে। দু-জনেই তার বড়। বকুলের ভাগে তাই বেশি কিছু পড়েনি। কিন্তু সময় পেলে বকুলের চারদিকেও একটা ছোট্ট সংসার গড়ে দিতে পারত যীশু। হল না।

যীশু আজ ভাবল, চারদিকটা এত ভেঙে পড়ছে কেন? দোষ কি শুধু তার? তারই?

গভীর রাত অবধি চুপচাপ একা বসে থাকল সে। উঠল না, নড়াচড়াও করল

না লক্ষ মশার কামড় সত্ত্বেও।

যখন মাংস দিয়ে পাঁউরুটি খাচ্ছে তখন রাত বারোটা।

ঘরটা গরম বটে, তবু জানালা খুলল না যীশু। পাখার স্পীডটা পুরো করে দিয়ে বহুদিনকার না ঝাড়া বিছানার বেডকভারটা তুলে শুয়ে পড়ল। পাখার নিচে তত মশা লাগবে না।

শুয়েই যে ঘুম এল এমন নয়। মাথাটা গরম। ঘাম হচ্ছে।

ঘুমিয়ে পড়ার পর যীশুর চোখের সামনে হিজিবিজি স্বপ্নের খেলা। স্বপ্ন জীবনে খুব কম রাতেই দেখেছে যীশু। আজকাল প্রতি রাতেই দেখে। বেশির ভাগই দুঃস্বপ্ন।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙল দরজার শব্দে।

কে?

জবাব নেই।

দরজা খুলে যাকে দেখল যীশু, তাকে দেখার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তার শ্বশুর। সঙ্গে যুবক শালা।

শ্বশুরমশাই রীতিমতো ঘাবড়ানো গলায় বললেন, ওঃ তুমি এসেছো বুঝি? কখন এলে?

যীশু জবাব না দিয়ে পাল্টা জিজ্ঞেস করল, কী চাই?

ঠিক যেভাবে অচেনা আগন্তুককে জিজ্ঞেস করা হয়।

শ্বশুরমশাই আমতা আমতা করে বললেন, মানে এই বকুলের কয়েকটা জিনিস নিতে এসেছিলাম।

যীশু দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল, শ্বশুর আর শালা দ্বিধাজড়িত পায়ে ঘরে ঢুকতেই সে বেরিয়ে গিয়ে সিঁড়ির নিচে কলঘরে ঢুকল। দাঁত মেজে চোখে জলটল দিয়ে যখন ফের ঘরে ঢুকল তখন শ্বশুর একটা খোলা তোরঙ্গের সামনে হাঁটু গেড়ে বসা। কিছু শাড়িটাড়ি মেঝের ওপর।

বকুলের সব জিনিসই তো আপনারা নিয়ে যেতে পারেন। নেননি কেন? ওর জিনিসপত্র এখানে ফেলে রাখার তো আর কোনো মানেই হয় না।

ইয়ে হ্যাঁ মানে—

যীশু স্টোভ জ্বালানোর জন্য দেশলাই খুঁজতে খুঁজতে বলল, সামনের মাসে আমি হয়তো ঘরটা ছেড়ে দেবো। আপনারা ওর সব জিনিস নিয়ে যাবেন।

ঘরটা ছেড়ে দেবে? কেন, তুমি কি আর এখানে থাকবে না?

না।

যীশু স্টোভটা ধরাল। জল চড়াল। যুবক শালাটি তাকে আড়চোখে

দেখছে। কী দেখছে তা ওই জানে। সম্ভবত জ্বলজ্যান্ত একজন খুনীকে ও এর আগে আর দেখেনি।

তোরঙ্গটা বন্ধ করে ফের চৌকির নিচে ঠেলে দিলেন শ্বশুরমশাই। জিনিসগুলো একটা পোঁটলা বাঁধতে বাঁধতে বললেন, বকুলকে বলবখন।

যীশু একথার কোনো জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না।

শ্বশুর চলে যাওয়ার আগে একটু ইতস্তত করছিলেন।

তুমি তাহলে এখন দেশের বাড়িতেই থাকবে?

কিছু ঠিক নেই।

যতদূর শুনছি তোমার বিরুদ্ধে পুলিশ খারাপ রিপোর্ট দেয়নি।

যীশু কথাটার জবাব দিল না। জল ফুটছে। সে স্টোভটার দিকে চেয়ে ছিল।

শ্বশুর আর একটুক্ষণ গাড়লের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমি তাহলে—

যীশু কিছুই বলল না।

শ্বশুর আর শালা সন্তর্পণে চলে গেল।

যীশু উঠে পোশাক পরতে লাগল। পুলিশ তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। প্রশাসনই সেই চেষ্টা করবে। কারণ যীশু নয়, প্রেস্টিজটা সমস্ত প্রশাসনের। সেল-এর মধ্যে কয়েদী খুন হওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

কিন্তু কী হবে? যীশুর কিছুই তাতে বদল হবে না। কিছুই না।

ঘন্টাখানেক বাদে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে থানায় ফোন করল যীশু।

আমি যীশু বড়বাবু।

বলো হে। কী খবর?

আমার দিকে কোনো খবর নেই। একই রকম।

এনকোয়েরির খবর জানো?

না। কালই তো আপনি বললেন, এনকোয়ারি আরো হবে।

হবে না। যা হওয়ার হয়ে গেছে। মাথাটা বেঁচে গেল তোমার। কোথা থেকে ফোন করছ?

হাওড়া স্টেশন। দেশে ফিরে যাচ্ছি।

কাল ওই মেয়েটা এসেছিল। সামু পেরেরার রাখা মেয়েছেলেটা। জানকী। খুব কষে ধমকে দিয়েছি। চারদিকে এমন একটা পাবলিসিটি করে বেড়াচ্ছিল।

জানি। জানকী বলেছে।

বলেছে। দেখা হয়েছিল নাকি?

হ্যাঁ স্যার, কাল আমি ওর ঘরে গিয়েছিলাম।

যীশু, একদিন ইউ উইল বি মারডারড। ওই ডেভিলস ডেন-এ গিয়েছিলে? তোমার মাথাটাথা খারাপ নাকি?

আমার তো আর কিছু করার নেই স্যার। চলে গেলাম।

মেয়েছেলেটা ডেনজারাস। কোনো চার্জ পেলে ভাবছি অ্যারেস্ট করে ফেলব। চার্জ পাওয়াই যাবে। শী লিভস অ্যান আনহোলি লাইফ।

উই অল লিভ আনহোলি লাইভস স্যার।

আরে সে তো ফিলজফি। যীশু, আমি ফিলজফির এম এ, মনে রেখো।

মনে আছে স্যার, ভাল ভাল কথা তো একমাত্র আপনিই বোঝেন।

হেঁঃ হেঁঃ, এই পুলিশ সারভিস আমার লাইন নয় হে, ইচ্ছে ছিল ফিলজফির প্রফেসর হবো। হল না।

কিন্তু আমি স্যার, পুলিশ হওয়ার জন্যই জন্মেছিলাম। এই নোংরা শহর আর পাজি লোকজনের মধ্যে আমি যত কমফোর্ট ফিল করি তত অন্য কোথাও নয়।

বড়বাবু সঙ্গে সঙ্গে সমবেদনার গলায় বললেন, আই নো যীশু। তুমি—মানে তোমার মধ্যে দেয়ার ইজ অ্যান ইনবর্ন পুলিশ। পাক্কা রিপোর্ট আর ডাইরেকটিভ কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের হাতে এসে যাবে। তোমার রিইনস্টেটেড হতে বাধা হবে না। তবে বোধহয় ট্রানসফার করবে।

জানি স্যার। আমি কিছুদিন বিশ্রাম চাই।

মাঝে মধ্যে এরকম ফোন করো। ভাল কথা, তোমার ফ্যামিলি ম্যাটার কি সেটেলড্ হয়েছে? শুনলাম কালও তোমার বউ আর শ্বশুর থানায় এসেছিল।

না স্যার।

ব্যাড, ভেরি ব্যাড।

আসি স্যার।

যীশু ফোন রেখে গিয়ে গাড়ি ধরল।

সাইকেলে উঠে শর্টকাটটা ধরে ফিরছিল যীশু। দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। যেইখানে সাপটাকে মেরেছিল তার কাছাকাছি আসতেই সামান্য পচা গন্ধ পেল সে। সাপটা সেরকমই পেট উল্টে মরে পড়ে আছে। একটু খোবলানো শরীর। আক্রমণ নেই, বিষদাঁতের ভয় নেই, সাপটা আর সাপই নয়।

খেয়ে উঠে জ্যাঠামশাই সামনের বারান্দায় বসে আছেন। যীশু সাইকেল থেকে নেমে সামনে দাঁড়াতেই বললেন, কোথায় গিয়েছিলে?

কলকাতায়।

নায়ে খায়ে আসো গা। পরে শুনবখন সব কথা।

যীশু ভিতরবাড়িতে ঢুকতেই বউদি বলল, তোমার একটা চিঠি আছে ঠাকুরপো। খামের চিঠি। দেখ তো, বকুলের নাকি।

না, বকুলের নয়। হাতের লেখাটা মেয়েলি বটে।

যীশু চিঠিটা খুলল। কমলের লেখা।

যীশুবাবু, আমার জন্যই এত বিপদে পড়তে হল আপনাকে। আমার যে কী খারাপ লাগছে। কেমন আছেন আপনি ? একবার কি দেখা করা যায় না ? খুব মনে পড়ে আপনার কথা। সারাক্ষণ মনে পড়ে। একটুও ভুলতে পারি না। আমার জীবনটা ফাঁকা হয়ে গেছে। কিন্তু আপনার তো তা ছিল না। আমার কপালটাই বোধহয় এমনি। যার সংস্পর্শে আসি তারই কিছু ক্ষতি হয়। শাস্ত্রে কি একেই বিষকন্যা বলে ? এখন কিন্তু আমার জীবনে অনেক মজার ঘটনা ঘটছে। এতদিন বাবা কত সম্বন্ধ খুঁজেছেন বিয়ের জন্য। পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন এই ঘটনার পর অনেকেই আমাকে বিয়ে করতে রাজি। তারা অবশ্য পাত্র হিসেবে আহা মরি কিছু নয়। কিন্তু আগ্রহ যে দেখাচ্ছে সেটাই কি কিছু কম ? মজা নয় ? আমার একজন বোবা আর কালা বোন আছে। আপনি বোধহয় জানেন তার কথা। সেই বোনের বিয়ে অনেকদিন আগে থেকেই ঠিক হয়ে ছিল। এবার তার বিয়ের তোড়জোড় হচ্ছে। কেমন লাগছে আমার বলুন তো। দারুণ। তবে এ বিয়েতে আমি যাবো না। কী জানি যদি আবার কিছু হয়। আপনি কেমন আছেন ? সত্যিকারের কেমন আছেন ? আমি চাকরি খুঁজছি। ভীষণভাবে খুঁজছি। আপনি কি আমার চিঠির জবাব দেবেন ? ভীষণ অপেক্ষা করব, আশা করব আপনার চিঠির। আপনার দুর্ভাগ্যের জন্য কেবল নিজেকেই সবসময়ে দায়ী মনে হয়। কত কাঁদি। একদিন বিজয় এসেছিল। মাঝে মাঝে আসে। সে বলল, আপনার সঙ্গে আপনার স্ত্রীর নাকি বনিবনা হচ্ছে না। দুর্ভাগ্য যখন আসে তখন নানাদিক থেকে আসে। আপনার সঙ্গে এ ব্যাপারে আমার বেশ মিল আছে। আমার ছোটো বোনের ভাবী শ্বশুরবাড়ি থেকে ওকে অনেক গয়না দিয়েছিল। বিয়ের দিন তার দু চারখানা আমাকে পরানো হয়। বোনের হবু শাশুড়ি এসে কত অপমান করে গেল তার জন্য। অজয় সাধুর বাড়িতে বিধবা সেজে গিয়েছিলাম বলেও তো কম লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়নি। কিরকমভাবে বেঁচে আছি বলুন। তার ওপর আপনার জন্য কষ্ট। কী হতে কী হয়ে গেল, ভাবলে কেবল কান্নাই পায়। কিন্তু আমার কেবল মনে হয়, আপনি কিছুতেই হার মানবেন না। আপনাকে কেউ কখনো ভেঙে ফেলতে পারবে না। কী জানাবো আপনাকে বলুন তো। প্রীতি আর শুভেচ্ছা ? বড্ড কেতাবী শোনাবে। তার চেয়ে বরং বলি, ভাল থাকুন, শক্ত হোন, রোজ ভগবানের কাছে আপনার জন্য

আমি প্রার্থনা করি। ইতি কমল।

কে লিখেছে? বকুল?

না বউদি।

তবে কে?

তোমার বড্ড মেয়েলি কৌতূহল। চিঠিটা তো বোধহয় খুলে পড়েছো। আঠার জায়গাটা ভেজা ভেজা দেখছি।

বাসন্তী হি হি করে হাসল। তারপর বলল, আহা, পড়লে দোষ কী?

পড়লে দোষ নেই। এটা তো আর প্রেমপত্র নয়। কিন্তু অত অভিনয়ের দরকার কী ছিল? বললেই হত যে পড়েছো।

রাগ করলে?

না। চিঠিটা তোমার কাছেই রেখে দাও।

আচ্ছা বাবা, নাক কান মলছি, আর কখনো ওরকম কাজ করব না। পুলিশের চোখকে কি আর ফাঁকি দেওয়া যায়? কিন্তু কমলটা কে বলো তো।

অজয় সাধুর সঙ্গে যার বিয়ে হচ্ছিল।

সেই মেয়েটা। ও বাবা, সে তোমাকে চিঠি লেখে কেন?

লিখলে দোষ কী?

মেয়েরা পরপুরুষকে চিঠি লিখলে দোষ হয় না?

গাঁয়ে হয়। শহরে হয় না। দু জায়গায় দুরকম নিয়ম।

তা অবশ্য ঠিক। আচ্ছা মেয়েটা কী সেজে থাকে বলো তো। সধবা না বিধবা?

কোনোটাই নয়। বিয়েই হয়নি, কাজেই সধবা বা বিধবা হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। মেয়েটা কুমারী।

আমার কিন্তু তা মনে হয় না।

তোমার মনে হওয়ার ওপর তো সংসারটা চলবে না। গামছা-টামছা এগিয়ে দাও, স্নান করে আসি।

মেয়েটা বিধবাই। আমরা তো ও নিয়ে রোজ দুপুরে তুমুল তর্ক করি।

তোমরা মানে কারা?

ওই যে সব আমার বন্ধুরা আসে।

কূটকচালি ক্লাব?

বড্ড খোঁড়ো তুমি। শাস্ত্রে কী বলেছে জানো? মনে মনে কাউকে স্বামী বলে ভাবলেই বিয়ে বলে ধরতে হবে।

কোন শাস্ত্র?

অত কি জানি ? গীতায় বলেনি ?

তোমার মাথা। জ্যাঠা রোজ গীতা পড়ে। কাছে বসে শুনো, মাথা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আচ্ছা না হয় গীতা না-ই হল। মনু বলেনি ?

মনুও তো তুমি পড়োনি।

ও বাবা। ওসব শাস্ত্র কি মেয়েদের পড়তে আছে ?

কে বারণ করেছে ?

শাস্ত্রেই বারণ।

বাঃ বেশ। সব সমস্যার সমাধান।

তুমি বাপু বড্ড ঠোঁটকাটা। যাও, স্নান টান করে এসে খেয়ে নাও। আমার এবেলা খাওয়া হবে কিনা ভগবান জানেন।

কেন, তোমার কি আবার উপোস টুপোস নাকি ?

সধবার একাদশী। তোমার দাদা সেই কাকভোরে কলকাতায় গেছে। পার্টির প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা না করে ফিরবে না। কখন ফেরে এখন দেখ।

নমিনেশনের জন্য নাকি ?

তাছাড়া আবার কী ? দিনরাত বারবাড়িতে বসে ঘোঁট পাকাচ্ছে। আমার বাপের বাড়ি থেকে সাবধান করে দিয়েছে গয়না টয়না যেন সব পাচার করে দিই। নইলে ওই লোক ভোটে নামলে ঘরের ঘটিবাটিতে পর্যন্ত টান পড়বে। পার্টি ফাণ্ডে দেবে বলে আজই তো হাজার দশেক টাকা সঙ্গে নিয়ে গেছে। বার বার বলছে, ইস, এবার এদিকে একটা বন্যা বা মড়ক লাগল না। তাহলে রিলিফের কাজে নেমে নাম করে ফেলতাম।

জ্যাঠা কিছু বলে না ?

কী বলবেন উনি ? সবই দেখেন, বোঝেন, কিছু বলতে গেলে যদি মান না থাকে ? তোমার দাদা কী বলে জানো ?

কী বলে ?

বলে, টাকা পয়সা জলের মতো খরচ হবে বটে, কিন্তু ইলেকটেড হলে তিন মাসে উশুল করে নেবো।

বাঃ, লাইন ধরে ফেলেছে দেখছি।

তবে আর বলছি কী ? তুমি বাপু, একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখো তো। লাভলি বড় হচ্ছে, প্রায় বিয়ের যুগ্যি। তার একটা খরচ আছে না সামনে ? একটা মাত্র সন্তান।

যীশু কী বলবে তা বুঝতে পারল না। গামছা নিয়ে স্নান করতে গেল পুকুরে।

এত সাপ জন্মে দেখেনি যীশু। ঢোঁড়া সাপের বোধহয় এ সিজনে বিস্তর বাচ্চা হয়েছে। জলময় অন্তত সাত আটটা ছোটো বড় সাপ দেখতে পেল সে। চিত্রবিচিত্র। সাঁতার দেওয়ার সময় গা ঘেঁসে গেল দু একটা। গতকালও ছিল না এগুলো, আজ যে কোথা থেকে এল ?

পুকুর থেকে স্নান সেরে যখন ফিরছে যীশু, তখন জ্যাঠামশাই বারান্দায় নেই। কিন্তু বিরাট একটা জটলা হচ্ছে বাইরে। হাসির হররা শোনা যাচ্ছে দূর থেকে।

বুড়ো হরিশ চেঁচিয়ে বলছিলেন, হচ্ছে না মানে ? হইয়ে ছাড়ব। কেমন, আজ দেখলি তো তোরা।

একজন মোটা ঘর্মাক্ত লোক বলছিল, লেগে পড়ো আর কী। পোস্টারটা দারুণ করে করো দিকি। আর ছোঁড়াগুলোকে এখন থেকেই কাজে লাগাও। আমার নন্দটাকেও ভিড়িয়ে দেবোখন। বসেই তো আছে।

জটলার মাঝখানে হাসিমুখে পরেশ। খুব ঘামছে, মাথার চুল যাও বা অবশিষ্ট দুচার গাছা তা হাওয়ায় খাড়া হয়ে আছে।

যীশুকে দেখে হল্লাটা হঠাৎ চুপ মারল। সবাই তার দিকে বিগলিত মুখে চেয়ে।

যীশু দৃকপাত করল না। পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। শুনল, বাইরে এবার তুমুল আলোচনা হচ্ছে।

বউদি।

বাসন্তী আলনা গোছাতে গোছাতে ফিরে চাইল।

তোমার একাদশী ঠাকুর এসে গেছে।

এসেছে সে দেখেছি। এখন ঘরে কখন আসে দেখ।

কী মনে হচ্ছে ? নমিনেশন পেয়ে গেল নাকি ?

কে জানে বাবা। পেয়ে থাকলে বোধহয় এবার থেকে বাড়ি আসাই বন্ধ করবে। যা বারমুখো হয়েছে ইদানীং।

যীশু যখন খেতে বসেছে তখন পরেশ রান্নাঘরে এসে ঢুকল। গা থেকে রোদের তাপ আর ঘামের গন্ধ আসছে। গায়ে ময়লা পাঞ্জাবি আর পরনে ধুতি। এখনো ছাড়েনি।

ওঃ, আজ একেবারে কেলেংকুরিয়াস কাণ্ড।

জ্যাঠা আর বাবা দুই ভাই ছিল। যীশুর বাবা মরে গেছে কবে। তারও আগে গেছে যীশুর মা আর জ্যেঠিমা। যীশুরা দুই বোন আর এক ভাই। জ্যাঠার শুধু ওই একটি মাত্র সন্তান পরেশ। পরেশের মাত্র এক সন্তান। লাভলি। যীশুর

সন্তান নেই, কোনোদিন হবে কিনা কে জানে ? মোটামুটি বংশে এখন তারা দুটি মাত্র ভাই। পরেশ তার আপন দাদা না হয়েও আপনের মতোই। এই বোকাসোকা, সরল, ভালমানুষ দাদাটির প্রতি যীশুর কিছু সহানুভূতি আছে। ছেলেবেলা থেকেই পরেশ যীশুর হ্যাপা সামলেছে। এমন কি যীশুর দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে মার খেতেও পিছপা হয়নি।

যীশু মুখ তুলে বলল, কী হল ?

ওঃ সে এক কাণ্ড। প্রেসিডেন্ট আমার সঙ্গে চার মিনিট কথা বলেছে আজ। ঘড়ি ধরে চার মিনিট। আরও সব উমেদার ছিল, কাউকে পাত্তাই দেয়নি। আমার সঙ্গে একেবারে চার মিনিট। ঘড়ি ধরে।

নমিনেশন পেলে ?

সেভেন্টি পারসেন্ট সিওর। হয়েই গেছে বলা যায় একরকম। হরিকাও খুব বলেছে আমার হয়ে। প্রেসিডেন্ট তো আর হরিকার আজকের চেনা নয়। হরিকা বলে সেই যখন ইজের পরত তখন থেকে চেনে। অতটা হবে না। তবে হরিকাকে খুব মানে দেখলাম।

টাকাগুলো দিয়ে এলে।

দিলাম। তবে প্রেসিডেন্ট নিজে নেয়নি। বলল, পার্টি অফিসে গিয়ে জমা দিতে। সেই পার্টি অফিস ঘুরে আসতেই তো এত দেরি। কালীঘাটেও মাকে গিয়ে একটা প্রণাম ঠুকে এলাম। ওঃ আজ একেবারে বুকটা হালকা লাগছে। চার মিনিট সময় তো আর চাট্টিখানি নয়। প্রেসিডেন্টের চার মিনিট মানে আমাদের চার ঘণ্টা।

সে তো বটেই।

তাই সবাই বলছে, নমিনেশন পাবোই। এত সময় ধরে যখন কথা বলেছে তখন আর দেখতে হবে না। এখন থেকেই বেসওয়ার্ক শুরু করে দিতে হবে।

যীশু তার বউদির দিকে তাকাল। বউদি স্বপ্ন-দেখা মেয়ে নয়। একটু বিবর্ণ মুখ করে ঘোমটার ভিতর থেকে স্বামীর দিকে চেয়ে আছে।

মোড়া টেনে পরেশকে বসতে দেখে যীশু বলল, দাদা, তোমার জন্য বউদি বসে আছে। যাও স্নান করে এসো।

আরে যাচ্ছি, যাচ্ছি। আজ এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, একটু জিরোই আগে। ধকলটা তো কম যায়নি আজ। ভোটটা যদি মেরে বেরিয়ে যাই তাহলে বাড়িটা পাকা করে ফেলব। রাস্তাঘাট সব বাঁধিয়ে দিতে হবে। জেলেপাড়ায় তিনটে টিউবওয়েল বসিয়ে দেবো কথা দিয়েছি।

তাহলে তো খবর ভালই বলতে হবে।

খুব ভাল। তবে কাঞ্জিলালটা আজ এক কাণ্ড করে বসল, সেইটেই যা ভাবনা হচ্ছে।

কী কাণ্ড?

তখন আমি প্রেসিডেন্টের ঘরে ঢুকিনি। হরিকা ছিল। হরিকার মুখেই শুনলুম, কাঞ্জিলাল নাকি প্রেসিডেন্টকে বলেছে, পরেশ বিশ্বাস নমিনেশনের জন্য এসেছে, কিন্তু ওর এক ভাই এস আই যীশু বিশ্বাস লক আপ-এ এক কয়েদীকে খুন করেছে, নমিনেশন দেওয়া ঠিক হবে না। বদনাম হবে।

যীশু খাওয়া থামিয়ে চেয়ে রইল।

পরেশ ময়লা রুমালে কপালের ঘাম মুছে বলল, হরিকা সামলে দিয়েছে। বলেছে, কেস পেণ্ডিং। খুন বলে প্রমাণও হয়নি। তাছাড়া সহোদর ভাইও নয়। প্রেসিডেন্ট নাকি কাঞ্জিলালের কথাটা গায়ে মাখেনি।

যীশু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিল?

আরে না। ওরা সব সাত ঘাটের জল খাওয়া লোক। মানুষ চেনে। খারাপ ভাবলে চার মিনিট ধরে কথা বলে? ছিল তো আরও সব। কারো সঙ্গে কথা বলেছে? তাকায়নি ভাল করে কারো দিকে।

যীশু কথা বলল না। খাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল।

আজ দীর্ঘক্ষণ বাদে দুপুরে যীশুর একটু শুতে ইচ্ছে করল। লাভলি তাড়াতাড়ি স্কুল থেকে ফিরেছে। খেয়ে এসে যীশুর পাশে বিছানায় বসে বলল, তোমার পিঠে সুড়সুড়ি দিয়ে দিই কাকা?

দে।

মেয়েটার আঙুলগুলোয় ম্যাজিক আছে। চমৎকার সুড়সুড়ি দিচ্ছিল পিঠে। যীশুর তন্দ্রা এসে গেল আরামে।

তোমার পিঠটায় ভীষণ ময়লা পড়েছে। ঘষো না কেন?

ঘষে দে।

কাল রবিবার আছে। গরমজল আর সাবান মাখিয়ে ছোবড়া দিয়ে ঘষে দেবোখন।

দিস।

বাবা এম এল এ হবে জানো? হলে আমাকে দশ ভরি সোনা দিয়ে হার গড়িয়ে দেবে বলেছে।

ও বাবা। তাই নাকি?

আরো কত কী বলছে পাগলের মতো। বলছে, নাকি একখানা অ্যাম্বাসাডার গাড়ি দেবে বাবাকে। সামনে ফ্ল্যাগ লাগানো, উর্দিপরা ড্রাইভার। আর বাড়িতে

ফোন এসে যাবে। আরো কত কী।

ভালই তো হবে।

ছাই হবে। বাবা পারবে নাকি? এখন তো একদম পাগলের মতো যা তা বলে যাচ্ছে আনন্দে। হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা। আমি আর মা আড়ালে হেসে বাঁচি না। নমিনেশনই পায়নি এখনো তো জেতা।

নমিনেশন না পেলে কী করবে?

তখন একাই দাঁড়াবে। বাবা না দাঁড়িয়ে ছাড়বে নাকি এবার?

যীশু চোখ বুজে রেখেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কাকা, ঘুমোলে?

তন্দ্রা আসছে।

তাহলে আমি যাই? একটু খেলি গে।

যা।

যীশু কিছুক্ষণ সত্যিই ঘুমোলো। তারপর বউদির ডাকে চোখ মেলে চাইল।

ওমা। এ কী কাণ্ড। তোমার চোখে দুপুরে ঘুম।

পেটে কথা গিসগিস করছে তো। এসো, জ্বালাও।

বাসন্তী চেয়ারে বসে বলল, শুনলে তো সব সব্বোনেশে কথা তোমার দাদার?

শুনলাম।

কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ি চলে যাবো ভাবছি। শ্বশুরমশাইয়ের জন্যই যা চিন্তা।

যীশু উঠে বসল। তারপর বলল, অত ভাবছো কেন? ভোটে দাঁড়াতে দাও। হেরে গিয়ে আক্কেল হবে।

ও মানুষের আক্কেল জন্মে হবে না। তোমার কথাটা ওঠাতে আমার ভীষণ খারাপ লেগেছে, বুঝলে? কিছু মনে কোনো না, তোমার দাদার ওরকমভাবে কথাটা বলা ঠিক হয়নি। ওর তো এখন মাথার ঠিক নেই। খেয়ে দেয়ে এই চড়া রোদে ফের কোথায় বেরিয়ে গেল সাইকেল নিয়ে। ওরকমই সব করে।

যীশু মাথা নেড়ে বলল, কিছু মনে করিনি বউদি। দাদাকে আমি চিনি।

বাসন্তী কিছুক্ষণ নখ খুঁটল। তরপর মুখ তুলে বলল, তোমাকে একটা কথা বলি। খুব জানতে ইচ্ছে করে।

কী কথা?

আচ্ছা বকুলের সঙ্গে তোমার কেমন সব হয়?

কী হয়?

আহা, ন্যাকা। বলি ওসব হয়টয় তো।

কোন সব ?

বাসন্তী হিহি করে হেসে বলল, বর বউয়ে যা হওয়ার কথা। সেক্স।

ওঃ তোমাকে নিয়ে আর পারি না।

আহা, খারাপ কথা হল বুঝি। ইংরিজিতে বললে তো আর দোষ থাকে না।

এটা আবার কে শেখালো ?

বলো না।

আচ্ছা অসভ্য হয়েছো তো। এসব জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করে না তোমার ?

ওমা। লজ্জা কিসের। কী থেকে তোমাদের এত গণ্ডগোল সেটাই বুঝতে চাইছি গো।

যীশু একটু হাসল। এই সরল পেট-পাতলা বউদিকে সে বিলক্ষণ চেনে। এর মনে পাপ টাপ নেই, কিন্তু অপার কৌতূহল আছে।

যীশু বলল, আমি তো বকুলের কাছে রাক্ষস ছাড়া কিছু নই। কাজেই ওসব একেবারেই কিছু হত না।

একদম না ?

জোর করে একবার বুঝি—সেও বিয়ের পর পর। তারপর দেখতাম আমাকে দেখলেই কেমন সিঁটিয়ে যায়। আর হয়নি।

তাই বলো।

কিছু বুঝলে ?

ওমা, না বুঝবার কী ? তোমাদের ওই থেকেই গণ্ডগোল।

খুব বুঝেছো। যা বুদ্ধি তোমার।

ওসব না হলে ভাব ভালবাসা হয় না, জানো তো ওটাই আসল।

তোমার মাথা।

খোঁজ নিয়ে দেখ, মেয়েটি বোধহয় ঠাণ্ডা।

আর খোঁজ নেওয়ার কিছু নেই। সম্পর্ক চুকে গেছে।

তুমি কি আবার বিয়ে করবে ?

ওঃ তোমাকে নিয়ে আর পারি না। দেখছো তো, হাজারটা সমস্যা আমার মাথায়, তার ওপর আবার এসব কথা ভাববো কখন ?

না, বলছিলাম, একা তো আর জীবনটা কাটাতে পারবে না। তোমার আর বয়সটাই বা কী।

ন্যাড়া বেলতলায় ক'বার যায় ?

বেলতলায় যদি মজা থাকে তবে যাবে না কেন ?

খুব কথা শিখেছো দেখছি।

বাসন্তী কিছুক্ষণ চিন্তিত মুখে ঠ্যাং দোলালো। তারপর বলল, আমরা বাপু, ছাড়ান-কাটানের কথা ভাবতেই পারি না। এই যে কেমন কুয়োর ব্যাঙের মতো একটা অন্ধকূপে পড়ে আছি, কোথাও বেড়াতে টেড়াতেও যাইনি কখনো, এমন কি ন মাসে ছ মাসে কলকাতাতেও যাওয়া হয়ে ওঠে না, রোজ কেবল রাঁধো বাড়ো খাও, তবু ওই নীরস মানুষটির সঙ্গে পড়ে তো আছি।

মানুষটা কি খুব নীরস?

ভীষণ। শখ নেই, আহ্লাদ নেই, মাথায় বাই চাপলে তো আরো চমৎকার। মাঝখানে ব্যবসার বাই চেপেছিল, দোকান খুলল, সে কি দৌড়াদৌড়ি। এখন আবার পলিটিকসের বাই চেপেছে। লোকটাকে তো আমি ভাল করে পাই-ই না। মাঝে মাঝে সংসারের মুখে নুড়ো জ্বেলে যেদিকে দু চোখ যায় চলে যেতে ইচ্ছেও করে। আবার ভাবি, কোথায় যাবো। এই বেশ আছি।

আমার তো মনে হয়, বেশ আছো। মাথায় বেশি প্যাঁচ যাদের নেই, তারা একরকম ভালই থাকে।

আবার যদি বিয়ে করো তাহলে এবার আমি পাত্রী ঠিক করে দেবো।

যীশু হাসল, মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে ঠিক অলরেডি করেই ফেলেছো।

বাসন্তী অবাক হয়ে বলে, কী করে বুঝলে?

বললাম তো মুখ্ দেখে।

বাসন্তী এবার হাসল, দাদা বুঝতে পারে, লাভলি বুঝতে পারে। আমি কিছু লুকোতে পারি না।

যীশু একটু হাসল। কিছু বলল না।

বাসন্তী একটু নড়ে চড়ে বসে বলল, আমার সইয়ের মেয়ে শিউলিকে তো দেখেছো। সুন্দর নয়?

কে শিউলি?

আহা, ওই যে দুপুরে আসে। না, তুমি দেখনি অবশ্য। হাঁ করে তোমার গল্প শোনে। করবে বিয়ে?

॥ ছয় ॥

কাল থেকে প্রায় একটানা কাঁদছে বকুল। যখন কাঁদছে না তখন তার কান মুখ চোখ ঝাঁ ঝাঁ করছে অপমানে। এত অপমান তাকে তো জীবনে কেউ করেনি। এত খারাপ গালাগালও সে কখনও খায়নি কারো কাছে। এত খারাপ কথা কারো মুখে আসতে পারে? বিশেষ করে কোনও মেয়ের মুখে।

ঘুমের মধ্যেও চমকে চমকে উঠেছে রাতে বকুল।

তার দোষটা কী ছিল তা এখনও সে বুঝে উঠতে পারেনি। সামু পেরেরার বউ শুনে যে মেয়েটাকে করিডোরে ডেকে নিয়ে গিয়ে শুধু জিজ্ঞেস করেছিল, কেন তারা ওরকম করছে। তার বেশি তো কিছু নয়, তাহলে তাকে ওরকম খারাপ কথা কেন বলবে মেয়েটা?

আজ ভোররাতে বকুল টের পেল তার জ্বর আসছে। মাথা ঘুরছে প্রচণ্ড। শীত শীত ভাব। শরীর খারাপই যাচ্ছিল ক'দিন। শরীর বড্ড শাদা, ডাক্তার বলেছে, রক্ত নেই। সাংঘাতিক অ্যানিমিয়া। আজকাল সে একটুও পরিশ্রম করতে পারে না। মানসিক আঘাত সইতে পারে না।

তার বাবা জগন্নাথ চৌধুরী আর ভাই মুকুল সকালে গিয়েছিল তার কয়েকটা শাড়ি বাসা থেকে নিয়ে আসতে, ফিরল ন'টা নাগাদ।

ঘরে ঢুকেই জগন্নাথ প্রকাণ্ড হাঁফ ছেড়ে বললেন, উরে বাব্বা, খুব বেঁচি গেছি, সাক্ষাৎ বাঘের মুখে পড়তে হয়েছিল।

বকুলের মা উদ্বেগের গলায় বললেন, কী হল?

আর বোল না, গিয়ে দেখি দরজায় তালা নেই, ভিতর থেকে বন্ধ। অগত্যা দরজায় ধাক্কা দিতে হল। বুকটা তখনই দুর দুর করছিল, ভিতরে জামাই নাকি?

যীশু ছিল?

তবে আর বলছি কী? বাজখাঁই গলায় হাঁক ছাড়ল কে? আমি ভয়ে আর জবাব দিতে পারিনি। দরজা খুলে সে কী মেজাজ। কী চাই? চোখের দিকে তাকাতে আর ভরসা হয়নি।

অপমান করল নাকি?

অপমানই তো। শ্বশুরের সঙ্গে কেউ ওভাবে কথা বলে? তার ওপর আবার বলে দিল যেন বকুলের জিনিসপত্র সব নিয়ে আসি। ও সামনের মাসে ঘর ছেড়ে দিচ্ছে।

অপমান করল আর তুমি ছেড়ে দিয়ে এলে? কিছু শুনিয়ে দিয়ে এলে না কেন?

মেয়ের বাপকে কথা হজম করতে হয়। উপায় কী?

মুকুল এতক্ষণ কথা বলেনি। এবার বলল, বাবা যা-ই বলুক মা, আমার কিন্তু যীশুদার ব্যবহার কিছু খারাপ মনে হয়নি। তেমন পাত্তা দিচ্ছিল না, সেটা দেওয়ার কথাও নয়। যীশুদার সময়টা তো ভাল যাচ্ছে না।

ওরকম লোকের সময় ভালো যাওয়ার কথাও নয়। মেয়েটা একবছর ঘর করতে পারল না, শুকিয়ে আধখানা হয়ে ফিরে এল, তবু ভালো, প্রাণে বেঁচে

আসতে পেরেছে। যখন তখন খুন হয়ে যেতে পারত তো।

মুকুল আর কিছু বলল না। সরে গেল

বকুল সবই শুনতে পাচ্ছিল। কিন্তু কিছুই স্পর্শ করছিল না তাকে। জ্বর বাড়ছে। একটা নেশার ঝিমঝিম ভাবের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে সে। শরীর বড্ড অবশ, বড্ড দুর্বল।

শুনেছিস বকুল ?

কী শুনবো ?

যীশু তোর বাপকে কী রকম অপমান করেছে।

শুনেছি।

ঘর নাকি ছেড়ে দেবে। তোর জিনিসপত্র নিয়ে আসতে বলেছে।

শুনেছি।

আমি তো বুঝি না, কেন তুই আধ খ্যাঁচড়া কাজ করছিস। ও খুনে লোকের সঙ্গে আর একদিনও বাস করা উচিত নয় তোর। ও পাট চুকিয়ে দেওয়াই ভাল।

পাট তো চুকেই গেছে।

জিনিসগুলো তবে আমি গিয়ে আজ বিকালে নিয়ে আসি।

যেও।

ভাল করে ভেবে বল।

বলছি তো।

উকিলের নোটিশটা তো এখনো দিতে দিলি না। কাজটা ভাল করছিস না।

দিয়ে দাও না।

বলছিস তো মন থেকে ?

বলছি।

আমার কাছে বাপু মেয়ের প্রাণের দাম অনেক বেশি। অত যখন তাকে তোর ভয় তখন ঘর করবি কী করে ? বিপদ মাথায় নিয়ে কি সংসার করা যায় ?

বকুল জবাব দিল না। তার মাথায় কোনো কথা আসছে না। শুধু কে যেন মাঝে মাঝে ফুঁসে উঠে বলছে, খানকির মেয়ে!

বকুল এপাশ ওপাশ করল খানিকক্ষণ। শরীরে একটা ভীষণ অস্বস্তি। ব্যথা, আড়মোড়া, শিরশিরানি।

মুকুল ? এই মুকুল! শোন!

মুকুল এল, কী বলছিস ?

তোদের কি ও খুব অপমান করেছে ?

না তো! বাবার যেমন কথা! সব কিছুকেই বাড়িয়ে দেখে।

বকুল অর্থহীন চোখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, ঘর ছেড়ে দিচ্ছে বলল ?

হ্যাঁ।

কেন ?

তা বলল না।

ওর কি চাকরি চলে গেছে ?

যাওয়ারই তো কথা।

ভাল করে একটু খোঁজ নিবি ? থানায় একটু ফোন করলেই জানা যাবে।

নেবো, তোর জ্বর কত ?

দেখিনি। অনেক হবে।

মুকুল একটু দিদির মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, বাবাকে মা উকিলের বাড়ি পাঠাল। ডিভোর্সের নোটিশ দিতে।

বকুল চোখ খুলে ফের অর্থহীন কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর চোখ বুজে বলল, ও।

নোটিশটা আরও কিছুদিন পরে দিলেও হত।

বকুল চোখ খুলে বলল, যা না একটু থানায়। খোঁজ নিয়ে আয়।

যাচ্ছি।

আর শোন, মাকে বলিস না, আমাকে একটা রিক্সা ডেকে দে।

রিক্সা। কি বলছিস ?

দে না। কাছেই যাবো, ভীষণ দরকার।

পাগল নাকি ? ঘুমো। কিছু করতে হলে বল আমি করে দিচ্ছি।

ঠিক আছে। যা। এখন কিছু দরকার নেই।

এই বলে বকুল পাশ ফিরে চোখ বুজল। অপেক্ষা করল। দশ মিনিট বাদে বকুল উঠল। মাথা কি খুব ভার ? শরীর কি টলছে ? তা হোক। সে পারবে।

উঠে বকুল শাড়ি পালটাল। এলো চুল খোঁপা করে বাঁধল, মুখে সামান্য পাউডার দিল। আর তা করতেই এত পরিশ্রম হল তার যে হাঁফাতে লাগল।

এ সময়ে মা ঠাকুরঘরে পাক্কা এক ঘণ্টা কাটাবে। বাবা বাড়িতে নেই। বকুল বেরলো।

বকুল চটিটা পায়ে দিয়ে হ্যান্ডব্যাগটা বগলে চেপে ছাতা নিয়ে নামল রাস্তায়। রিক্সা ধরল। বড় রাস্তায় এসে মিনিতে উঠে পড়ল। অনেকটা রাস্তা। তবু যেতে হবে।

ঘরের সামনে এসে যখন দাঁড়াল বকুল তখন তালা ঝুলছে। দুর্বল বকুল

থরথর করে কেঁপে বসে পড়ল দরজার সামনে। যীশু নেই। বাড়িওলার বউ চেঁচিয়ে বললেন, কে গো ওখানে?

বকুল ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিল, আমি মাসীমা।

কে? ও তুমি?

সম্পর্কটা যে খুব ভালো তা নয়। বকুল যখন নতুন বউ হয়ে যীশুর ঘর করতে এল তখন প্রথমেই তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল বাড়িওলার ব্যবহারে। লোকটা নিজে স্ত্রৈণ, বউটা অসম্ভব কুটিল এবং রাগী, দুটি ছেলে পাড়ার ক্লাবের পাণ্ডা। জল নিয়ে শাসানো হয়েছিল প্রায় প্রথম থেকেই। তারপর নানা ছুতোনাতা ত্রুটি ধরা তো ছিলই।

একদিন কলঘরের সামনে ময়লা জামাকাপড় সাবান কাচবে বলে জড়ো করেছিল বকুল। কলঘরে যীশু ছিল বলে ঢুকতে পারেনি, বাইরে রেখেই চলে আসে। ওই দৃশ্য দেখে বাড়িওয়ালা এবং তার পুরো পরিবারই ওপর থেকে চেঁচামেচি করেছিল।

যীশু ঘরে বসে কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ বকুলের দিকে চেয়ে বলল, বাড়িওয়ালা কাকে বকাবকি করছে বলো তো?

আমাকে। কলঘরের সামনে ময়লা জামাকাপড় রেখে এসেছিলাম তাই।

ও।

বলে কাগজটা রেখে যীশু অত্যন্ত স্বাভাবিক পায়ে বেরিয়ে গেল। তারপর সিঁড়ি ভেঙে তার ওপরে ওঠার শব্দ পেল বকুল।

নিচের ঘর থেকে কোনও চেঁচামেচি আর শুনতে পেল না বকুল। তবে তার চেয়ে বীভৎস দু'তিনটে শব্দ পেয়েছিল। বোধহয় চড়ের শব্দই। তবে এত জোরে যে কেউ কাউকে চড় মারতে পারে তা তার জানা ছিল না।

মিনিট পাঁচেক বাদে যীশু নেমে এসে আবার কাগজ পড়তে লাগল। একেবারে স্বাভাবিক মুখ। কোথাও কোনো উত্তেজনা নেই।

তুমি কাকে মারলে?

যীশু বকুলের এই প্রশ্নে যখন চোখ তুলে তাকাল তখন সেই চোখের দিকে চেয়ে চোখ ধাঁধিয়ে গেল বকুলের। চোখের মধ্যে এক তীব্র জ্বালার ফসফরাস জ্বলছে।

যীশু ঠাণ্ডা গলায় বলল, না মারলেও চলত। ওপরে যেতেই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তবু মারলাম, কারণ আমি ডিউটিতে গেলে তোমাকে এখানে একা থাকতে হবে। তখন যেন কিছু বলা বা করার সাহস না পায়।

সে সাহস আর বাড়িওয়ালা দেখায়নি। কিল খেয়ে কিল হজম করে

নিয়েছিল।

বাড়িওয়ালার সঙ্গে বলতে গেলে এই তাদের একমাত্র সংঘর্ষ। কিন্তু তার পরে থেকেই সম্পর্কটা ভীষণ ঠাণ্ডা, বাক্যবিনিময়হীন, এমন কি চোখাচোখিহীন।

বকুলকে দেখে বাড়িউলি নেমে এলে।

কী হয়েছে তোমার শরীর খারাপ নাকি?

হ্যাঁ।

তোমার বর তো একটু আগে চলে গেল। তোমার চাবি নেই?

আছে।

তবে ঘর খুলে একটু গিয়ে শুয়ে থাকো।

আমি ওর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলাম। ও কি দেশে চলে গেল?

আমাদের তো কিছু বলে যায়নি।

ও কি বাসা ছাড়বার নোটিশ দিয়ে গেছে?

না তো। তোমরা কি বাসা ছেড়ে দিচ্ছ?

বকুল মাথা নেড়ে বলল, জানি না।

বকুল ধীরে ধীরে উঠল। ব্যাগ থেকে চাবি বের করে তালা খুলে ঢুকল।

সারা ঘরে যীশুর পুরুষালি একটা গন্ধ ছড়িয়ে আছে। আর কেরোসিন তেলের পোড়া গন্ধ। বিছানা এলোমেলো।

বিছানায় একটু বসল বকুল।

বাড়িউলি ঘরের চৌকাঠে দ্বিধাজড়িত পায়ে এসে দাঁড়ালো।

বাসাটা যদি ছেড়ে দাও তাহলে এসময়ে আমাদের খুব উপকার হয়। বড় ছেলের বিয়ে দিচ্ছি। ওপরে তো বাড়তি ঘরই নেই।

বকুল এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ভদ্রমহিলার দিকে।

তোমার বরকে তো বাছা কিছু বলতে সাহস পাই না আমরা। চণ্ড লোক। কখন কী করে বসে। কী সব শোনাও যাচ্ছে ওর নামে। খবরের কাগজে লিখছে। আমাদের আর মান সম্মান রইল না।

বকুলের কি কিছু বলা উচিত? প্রতিবাদ করা উচিত?

আজ অবধি সে কারও সঙ্গে কখনও ঝগড়া করতে পারেনি। নির্জীব ঠাণ্ডা মেয়ে বলে চিরকাল তার খ্যাতি। এবং অখ্যাতিও।

বকুল কিছু বলতে পারল না। এখন সে একা। এখন তার আর কোনও আড়াল নেই।

বাড়িওয়ালি বলল, আজকাল বজ্জাত ভাড়াটিয়াদের যে-পয়সা দিয়ে তুলতে হয় তা আমরা জানি। তোমরা যদি চাও তো বোলো, টাকা দেবো। তবু ঘরটা

ছেড়ে দাও। আমাদের আর ভাড়াটের দরকার নেই।

বকুল কি কাঁদবে ? সারা রাতই সে একরকম কেঁদেছে। ঘুম হয়নি, চোখ জ্বালা করছে। শরীর ভরা জ্বর। এখনও কান্নার একটা কাঁপন তার শরীরে রয়েছে।

তবু কাঁদল না বকুল।

বাড়িওয়ালি খুবই কঠোর দৃষ্টিতে তাকে নিরীক্ষণ করে বলল, পাড়ার লোকেও আর চাইছে না যে যীশু এ পাড়ায় থাকুক, বুঝলে ? আমাদের কথাটা একটু ভেবো। ভালো মন্দ যা হয় দিন সাতেকের মধ্যে জানিয়ে দিও।

বকুল হঠাৎ মুখ তুলে বলল, মাসীমা ও তো কাল রাত থেকে এখানে ছিল, কথাগুলো ওকে কেন বললেন না ?

বাড়িওয়ালি একটু থতমত খেয়ে গেল। চোখ মুখ একটু কি বিবর্ণ দেখাল ? বলল, তাকে বলব ?

তাকেই তো বলা উচিত।

বাড়িওয়ালি একটু চেয়ে রইল বকুলের দিকে তারপর বলল, ঠিক আছে, আবার এলে বলব, কিন্তু তোমাকেও বলা রইল।

বাড়িওয়ালি চলে গেলে দরজাটা বন্ধ করে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল বকুল। যীশু কি চলে গেছে, নাকি ফিরে আসবে ? যদি আসে তাহলে বকুল তাকে কী বলবে ? সে কী বলতে চায় ?

বকুলের কিছুই মনে পড়ছে না। কোনও কথাই মনে পড়ছে না। যীশু কি কমলকে ভালবাসে ? বা কমল যীশুকে ?

ঘটনাটা কি ভাবে ঘটেছিল সবই জানে বকুল। থানা থেকে তখন প্রায়ই একজন কনস্টেবল আসত। একসময়ে মথুরা ছিল তাদের গয়লার ছেলে। বকুলের ছেলেবেলার চেনা। প্রায়ই খোঁজখবর করতে আসত। নানা গল্প করত থানার।

একদিন মথুরা বলল, দিদিমণি মেয়েছেলেটা তো 'ডোবাবে'।

কে মেয়েছেলে রে ?

ওই যে কমল ঘোষ। যীশুবাবুর সঙ্গে খুব মেলামেশা করছে।

সে কী ?

কাজটা ভালো হচ্ছে না। যীশুবাবুরও ও বাড়িতে খুব যাতায়াত। রোজ যাচ্ছে না। মেয়েছেলেটা অনেক কায়দা জানে। একবার বিধবা সেজে অজয় সাধুর সম্পত্তি গাপ করার চেষ্টা করেছিল। তারপর কুমারী সেজে এখন যীশুবাবুর মাথা চিবোচ্ছে। তুমি ঘর সামলাও।

বকুল ঘর সামলাবে ? কী করে সামলাবে ? সে তো জীবনে কিছুই সামলায়নি। তার কুমারী জীবন ছিল নিষ্কণ্টক এবং ঘটনাশূন্য। আদুরে মেয়েদের যা হয়ে থাকে সে ছিল ঠিক তাই। বিয়ের আগে পর্যন্ত সে নিজের হাতে কতই ভাত খেয়েছে ? খাইয়ে দিত তার মা না হয় বাবা। জীবনের সংকট সমস্যা তাকে কখনও স্পর্শ করেনি।

তার ওপর যীশু। বকুল যদি ফুলের পাপড়ি তো যীশু হল লোহার মানুষ।

তবু একদিন রাত্রিবেলা যীশু যখন খেতে বসেছে তখন বকুল সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করেছিল, কমল ঘোষ কে বলো তো ?

কেন ?

এমনি।

একটা মেয়ে। বিয়ের রাতে তার হবু বরকে খুন করা হয়।

সে কি তোমার কাছে আসে ?

আসে। কেন বলো তো ?

যীশু তার দিকে তাকাল। চোখে একটু কি কৌতুক ?

বকুল চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, কেমন মেয়ে ?

খুব ভালো। ফার্স্ট ক্লাস।

ভালো হলেই ভালো।

তোমাকে কমলের কথা কে বলল ? মথুরা ?

না। সবাই জানে।

তা অবশ্য জানে। কাগজেও উঠেছে।

ব্যস ওইখানেই কমল ঘোষের প্রসঙ্গে ইতি টানা হয়ে গিয়েছিল। আর তার পরেই এক রাতে ঘটল সেই ভয়াবহ ঘটনা। অনেক রাত অবধি সেদিন বাড়ি ফেরেনি যীশু। বকুলের মা ছিল বলে তখন প্রায়দিনই ফিরত না যীশু, তবে এক ফাঁকে এসে খেয়ে যেত। সেদিন খেতে এল না।

ভোরবেলা যখন এল তখন যীশুর দিকে তাকানোই যাচ্ছে না। এমন ভয়ংকর চেহারা তার কখনও দেখেনি বকুল। লাল টকটক করছে চোখ, চুলগুলো সাপের মতো ফনা ধরে উঁচিয়ে আছে। চোয়ালে বজ্র আঁটুনি। একটিও কথা বলল না কারোর সঙ্গে। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল। শুধু এক কাপ চা খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে আবার ইউনিফর্ম পরে বেরিয়ে গেল।

বেলা এগারোটায় এল মথুরা।

দিদিমণি, সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড।

কী রে ?

সামু পেরেরা সেল-এর মধ্যে খুন হয়ে গেছে কাল রাতে।

সে কী ?

যীশুবাবুকে রাতেই অ্যারেস্ট করা হয়েছিল। সকালে রিলিজ করা হয়। সাংঘাতিক কাণ্ড।

বকুল এমন নিবে গেল এই খবরে যে বলার নয়। কেমন অন্ধকার নিঃঝুম হয়ে গেল তার অভ্যন্তর।

মথুরা আরও একটু বলেছিল,ওই মেয়েছেলেটা ? ওটাই একাজ করিয়েছে। যীশুবাবুকে ওই ফুসলেছে, যেন লোকটাকে ডকে তোলা না হয়। যেন তার আগেই ওর ব্যবস্থা নিয়ে নেওয়া হয়। মেয়েছেলেদের চক্করে পড়লে কত কী যে হয় ?

আশ্চর্যের বিষয় এই স্বামীর প্রেমিকা বলে কমল ঘোষের ওপর তার হিংসে হয়নি। হিংসে হয়েছিল সম্পূর্ণ অন্যক কারণে। যীশু বিশ্বাসকে কোনো মেয়ে ভালোবাসতে পারে, ভয় পায় না, এমনটা সে কল্পনাও করতে পারে না। তারা কেমন মেয়ে যারা যীশুর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে মৃত্যুভয়ে ভীত না হয়ে ? তারা কারা যারা যীশু বিশ্বাসকে দিয়ে যা খুশি করিয়ে নিতে পারে ? সেই সব মেয়ের কাছে যে অনেক শেখার আছে তার।

আজ একা ফাঁকা ঘরে বসে কমল ঘোষের কথা খুব মনে পড়ল বকুলের। কেমন দেখতে মেয়েটা ? কেমন মানুষ ?

এক ঘণ্টা হয়ে গেছে। মা পুজোর ঘর থেকে বেরিয়েই তার খোঁজ করবে। তারপর হয়তো এসে হাজির হবে।

মা ! মা রটিয়েছিল, সকলের কাছে বলে বেড়িয়েছিল যে, যীশু নষ্ট চরিত্রের পুরুষ। ওই কমলের সঙ্গে লটঘট ছিল বলেই বকুলকে খুন করতে চায় জামাই।

বকুল জানে, কথাটা সত্য নয়। কমল ঘোষ যদি অনুপ্রবেশ করেই থাকে তবে করেছে অনেক পরে।

বকুল উঠল। ঘরে তালা দিল তারপর আবার বড় রাস্তায় এসে একটা মিনিবাস ধরল !

জায়গাটা বকুল চেনে না, কিন্তু আন্দাজে আন্দাজে চলে এল ঠিকই। একটু জিজ্ঞাসাবাদ করতে হল লোককে। বাড়িটা সবাই চেনে। যেখানে খুন হয়েছিল বিয়ের রাতে।

গরিব চেহারার বাড়িটার সামনে যখন পৌঁছল বকুল তখন তার জ্বর বেড়েছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। চোখের দৃষ্টি কেমন যেন হলুদ মাখা।

ফাঁকা উঠোনে এসে দাঁড়াল বকুল, কেউ কোথাও নেই। শুধু শুকোতে

দেওয়া লম্বা লম্বা শাড়ি কাপড়ে পর্দা হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। একটা দিশি কুকুর ভুক ভুক করে ডেকে চুপ করে গেল হঠাৎ।

একটু এদিক ওদিক ঘুরে দেখল বকুল। ছাড়া ছাড়া দু'তিনটে ঘর, পাকা হলেও টিনের চাল। বাইরে থেকেই বোঝা যায়, ঘরে সব দীন দরিদ্র আসবাব।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল বকুল। রোদ্দুরে, দুর্বল থরোথরো পায়ের ওপর, কাউকে দেখতে পেল না।

তারপর একজন বয়স্কা মহিলা উঠোন পেরোতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন তাকে দেখে।

কে? কাকে খুঁজছেন?

কমল ঘোষ এখানে থাকেন?

থাকে। কমল? ও কমল? দেখ, তোকে কে খুঁজছে।

কমল বেরিয়ে এল। পরনে একটা সাধারণ তাঁতের শাড়ি। এখনও স্নান করেনি। একটু অগোছালো, মুখখানা ঢলঢলে সুন্দর।

বকুল একদৃষ্টে চেয়ে ছিল। পিসার্তের মতো। কেমন মেয়ে? এ কেমন মেয়ে যে সব ভয়ভীতি ভেঙে যীশুকে—

আর ভাবতে পারল না বকুল।

কমলও তার দিকে চেয়ে ছিল একদৃষ্টে।

আপনি বকুল না?

বকুল অবাক হয়ে মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। কী করে চিনলেন?

আসুন, ঘরে আসুন। কী হয়েছে আপনার?

মেয়েটা এসে তার হাত ধরল।

বকুল এত নির্জীব বোধ করছে যে এক্ষুনি সে পড়ে যেতে পারে। শুকনো ঠোঁট নেড়ে সে বলল, আমার একটু দরকার ছিল।

আসুন। আপনার গা তো বেশ গরম।

যে ঘরে তাকে নিয়ে এল মেয়েটি সেটি ছোট্ট। একটা আলনা একটা চৌকি, একটা বইয়ের তাক। সামান্য কিছু জিনিসপত্রে দারিদ্র্যের ছাপ প্রকট।

কথা বলবেন না, একটু দম নিয়ে নিন, শোবেন? শুয়ে পড়ুন না।

বকুল মাথা নাড়ল, না, আমি এখনই চলে যাবো।

মেয়েটা কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে কাঁসার গ্লাসটা তার হাতে দিয়ে বলল, আপনার তেষ্টা পেয়েছে। খান তো।

বকুল ঠাণ্ডা জলটা ঢক ঢক করে খেয়ে নিল।

কি করে চিনলাম তা বলতে পারব না। কিন্তু হঠাৎ যেন মনে হল আপনিই

বকুল, যীশু বিশ্বাসের বউ।

এরকম কি হয় কখনও ?

হল তো।

বকুল কী বলবে তা ভেবে পেল না। আর এখন তার ভীষণ লজ্জা করতে লাগল।

কমল তার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে পাশেই বসে রইল। নীরবে, দুজনে অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না।

বললেন না কী দরকার ?

বকুল মাথা নিচু করে খুব আস্তে করে বলল, বুঝতে পারছি না।

কমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আপনার এবং আপনাদের অনেক ক্ষতি করেছি আমি। আপনি হয়তো জানেন না।

কী ক্ষতি ?

যা কিছু হয়েছে সব আমার জন্যই তো।

বকুল দুটি দুর্বল হলুদমাখানো চোখ তুলে কমলের দিকে তাকাল। তারপর হঠাৎ যে কথাটা বলল সেটা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক এবং অদ্ভুত। সে জিজ্ঞেস করল আমি এত দুর্বল কেন বলুন তো ?

আপনি ?

আমি কেন এত ভয় পাই ? আমারই কেন এত ভয় ?

কমল একটুও মজা পেল না এ কথায়। করুণাভরে চেয়ে রইল বকুলের দিকে। তারপর বলল আপনি তো আমাদের মতো নন।

কেন নই ?

আমাদের যে অনেক বিপদ পার হয়ে রোজ বেঁচে থাকতে হয়। কত অপমান সইতে হয়। তারপর আর লজ্জা সংকোচ ভয় তেমন থাকে না।

একটা কথা বলব ?

বলুন।

আপনি কি ওকে ভালোবাসেন ?

কমল একটু কেঁপে উঠল। কিন্তু জবাব দিল না।

বকুল সামান্য কাঁপা গলায় বলল, আমার বড় জ্বর। মাথার ঠিক নেই, কিছু মনে করবেন না।

কমল মাথা নাড়ল। তার দুই চোখ টলটল করছে জলে।

ওর চাকরি গেছে। হয়তো শাস্তিও হবে। আমাদেরও সংসার ভেসে গেল।

জানি।

আমি ওকে ভীষণ ভয় পেতাম। একা ঘরে থাকতেই পারতাম না ওর সঙ্গে। মনে হত, ঘুমের মধ্যে ও আমাকে যদি খুন করে? দেখুন, আমার মাথার ঠিক নেই, কী সব বলছি। কিন্তু এরকমই হত যে।

কমল চুপ করে বসে রইল, কিছু বলল না।

আমাদের বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে, জানেন?

জানি, শুনেছি।

কিন্তু—

বকুল অসমাপ্ত কথার মাঝখানে থেকে বালিকার মতো চোখে চেয়ে রইল। কমল দেখল, এ কোনো প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার চোখ নয়।

কমল গাঢ় গলায় বলল, কিন্তু কি?

কিন্তু ও কাছে না থাকলেই আমার কেমন জ্বর হয়, কি সব হয়, লোকে গাল দেয়, অপমান করে। জানেন?

কমল জানে না। এরকম অভিজ্ঞতা তার নেই। সাতপাকে বাঁধবার জন্য পা বাড়িয়েও একজনের রক্তে সে স্নান করে উঠেছিল।

কিন্তু সে কথা কি এই বালিকাকে বলতে পারে কমল। একে এখনো এই নিষ্ঠুর পৃথিবী স্পর্শই করেনি।

হঠাৎ বকুলের চমক ভাঙল, সে যেন এক তন্দ্রা থেকে জেগে উঠে কমলের দিকে তাকাল। কমলের দুই চোখ টলমল করছে জলে। বকুল হাত দিয়ে কমলের একটা হাত চেপে ধরল, আপনার স্বামীকেই তো খুন করেছিল সামু? আপনি—

এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল বকুল। মানুষ যত সাঙ্ঘাতিক অবস্থার মধ্যেও বেঁচে আছে! যীশু কার সঙ্গে লড়াই করে? যীশু কাকে মারে? যীশুর চোখ কেন ওরকম নিষ্ঠুর হয়ে যায়?

বকুল কি বুঝল?

না বুঝল না, কিন্তু আবছা অস্পষ্টভাবে তার মনে হল, লোকটাকে তার আর একটু জানতে হবে। আর একটু।

বকুলের হাত পা থর থর করে কাঁপছিল, জ্বর বাড়ছে। ক্রমশ হলুদ থেকে হলুদ হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী, তবু বকুল উঠে দাঁড়াল। যাই, আমাকে যেতে হবে।

ট্রেন কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাকে? কত দূর? বকুল ঘোরের মধ্যে শুধু মাঝে মাঝে স্টেশনের নাম পড়ে নিচ্ছিল।

একটা নাম চেনা ঠেকল, এইটিই কি স্টেশন?

বকুল নামল। যেতে হবে। যেতেই হবে। ততক্ষণ জ্ঞান হারালে চলবে না। কিছুতেই না।

রিক্সায় প্রায় ঢলে পড়ে রইল বকুল। কত জ্বর তার? কত জ্বর?

একটা মস্ত বাগান পার হয়ে রিক্সাটা ঝকাং ঝকাং করে একটা বারান্দার পাশে এসে থামল।

এই বিশ্বাসবাড়ি দিদি।

একজন বুড়ো মানুষ মুখের হুক্কাটা এক গাল থেকে আর এক গালে ঠেলে নিয়ে বললেন, নারায়ণ। বাপা। বাপা। দেখ, কে আসিছে। আমি চোখে ভাল ঠাহর পাই না। মনে হয়—

বকুলের ভয় ছিল যীশু বলবে, কী চাই?

লম্বা শক্ত কেঠো মানুষটা বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে ধীর পায়ে নেমে এল নিচে।

দুটো হাত বাড়িয়ে বলল, এসো।